গুপ্ত ও বাকাটক প্রশাসন

খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি বদল ঘটেছিল। পুরো উপমহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল রাজতান্ত্রিক শাসন। অরাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি কার্যত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে বৈশালী অঞ্চলে লিচ্ছবি গোষ্ঠীর গুরুত্ব ছিল। পরের দিকে বৈশালী সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের প্রাদেশিক শাসন

মানচিত্র ৬.৩ : গুপ্ত, বাকাটক এবং অন্যান্য কয়েকটি শক্তির শাসন এলাকা

কেন্দ্রে পরিণত হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পর উত্তর ভারতে অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী প্রায় ছিলই না। পাশাপাশি অরণ্য অঞ্চলের আটবিক রাজ্যগুলিও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক এলাকা হয়ে গিয়েছিল।

গুপ্ত শাসনের কাঠামোয় সম্রাটই ছিলেন প্রধান। বিরাট ক্ষমতা বোঝানোর জন্য তারা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন। বাকাটক রাজারা অবশ্য শুধু *মহারাজা* উপাধিই ব্যবহার করতেন। গুপ্ত সম্রাটরা অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখানোর

টুকরো কথা

চন্দ্ররাজার স্তম্ভ

দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে একটি উঁচু লোহার স্তম্ভ আছে। তার গায়ে একটি লেখ খোদাই করা হয়েছিল। তাতে চন্দ্র নামে এক শক্তিশালী বিষ্ণুভক্ত রাজার যুদ্ধজয়ের বর্ণনা আছে। লেখটিতে কোনো সাল-তারিখ নেই। ঐ চন্দ্ররাজা ঠিক কে তাও পরিষ্কার করে বলা নেই। লেখটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে খোদাই করা হয়েছিল।

ঐ চন্দ্ররাজাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলেই মনে করা হয়। লেখটিও তাঁরই সমকালীন। তাছাড়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। তবে অনেক মিল সত্ত্বেও লেখতে বলা সমস্ত অঞ্চল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত জয় করেননি। ঐ বর্ণনা অনেকটাই কাল্পনিক।

ছবি. ৬.৮:
সমুদ্রগুপ্তের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.৯:
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের
সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.১০:
কুমারগুপ্তের সোনার মুদ্রা

ছবি. ৬.১১:
স্কন্দগুপ্তের সোনার মুদ্রা

জন্য বড়ো বড়ো যজ্ঞ করেছিলেন। কুষাণদের মতোই গুপ্ত সম্রাটরাও নিজেদের দেবতার সঙ্গে তুলনা করতেন।

সম্রাটকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন রাজকর্মচারীরা। গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে বিভিন্ন পদ ও মর্যাদার রাজকর্মচারী ছিল। *অমাত্য* বা *সচিব* ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী। গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। প্রদেশগুলিকে বলা হতো *ভুক্তি*, যেমন *মগধভুক্তি*। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে ভুক্তির বদলে *দেশ* শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রদেশের শাসনভার থাকত গুপ্ত রাজপুত্রদের হাতে। বাকাটক শাসনে প্রদেশগুলি *রাজ্য* নামে পরিচিত ছিল। রাজ্যের শাসকদের বলা হতো *সেনাপতি*।

প্রদেশের থেকে ছোটো জেলা অঞ্চলগুলো গুপ্ত শাসনে *বিষয়* নামে পরিচিত হতো। বাকাটক শাসনে বিষয় শব্দের বদলে জেলা অঞ্চলগুলোকে বলা হতো *পট্ট* বা *আহার*। গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে সমস্ত শাসন ব্যবস্থাটা বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা ছিল। জেলা ও গ্রামস্তরের শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা জনপ্রতিনিধির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসনে যুবরাজ ও রানিদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে গুপ্ত শাসনের শেষ দিকে সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

৬.৫ গুপ্তদের পর উত্তর ভারতের অবস্থা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গুপ্তদের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকল। একসময় গুপ্ত সাম্রাজ্য গেল ভেঙে। আর তার জায়গা নিল ছোটো ছোটো রাজ্য। একেকটা অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে ওঠা সেই রাজ্যগুলিকে বলা হতো *আঞ্চলিক রাজ্য*।

পুষ্যভূতিদের রাজ্য : হর্ষবর্ধনের শাসন

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেবড়ো সাম্রাজ্য দেখা যায়নি। পুষ্যভূতি বংশের হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্য গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গোড়ায় পুষ্যভূতিরা থানেসর বা স্থানীশ্বরের শাসক ছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের সময় থেকে পুষ্যভূতিদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রভাকরবর্ধন মারা যান। তখন তাঁর বড়ো ছেলে রাজ্যবর্ধন শাসনের দায়িত্ব পান।

এদিকে কনৌজ-মালব দ্বন্দ্বে কনৌজের রাজা গ্রহবর্মা মারা যান। তাঁর সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের মেয়ে রাজ্যশ্রীর বিয়ে হয়েছিল। রাজ্যবর্ধন তখন মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহযোগী গৌড়ের রাজা

শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনও মারা যান। তখন হর্ষ কনৌজ ও স্থানীশ্বর — দুয়েরই শাসনভার নেন। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে হর্ষের সিংহাসনে বসার বছর থেকেই *হর্ষাব্দ* গোনা শুরু হয়।

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সেই সময়ের অনেকগুলি রাজশক্তির সংঘাত হয়েছিল। মগধ জয় করে হর্ষ *মগধরাজ* উপাধি নিয়েছিলেন। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষের বিরোধ ছিল অনেকদিনের। কিন্তু শশাঙ্ককে কখনই হর্ষ সরাসরি হারাতে পারেননি। চালুক্যশাসক দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গেও হর্ষর সংঘাত হয়েছিল। পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যিক বন্দরের দখলের চেষ্টা দুজনেই করেছিলেন। তবে যুদ্ধের ফলাফল হর্ষের বিপক্ষে গেছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি রবিকীর্তি আইহোল প্রশস্তি লিখেছিলেন। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যুদ্ধে হর্ষের হর্ষ (আনন্দ) ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

অনেক সামরিক অভিযান করলেও হর্ষের সব অভিযান সফল হয়নি। হর্ষকে *সকলোত্তরপথনাথ* (উত্তর ভারতের সমস্ত পথের প্রভু) বলা হয়েছে। কিন্তু আদতে সমস্ত উত্তর ভারতে হর্ষের শাসন ছিল বলে মনে হয় না। তবে উত্তর ভারতে শেষ বড়ো অঞ্চলের শাসক হিসাবে হর্ষবধনই সবথেকে বিখ্যাত। তিনি *শিলাদিত্য* উপাধি নিয়েছিলেন।

শাসনব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন হর্ষবর্ধন নিজে। তাঁকে সাহায্য করত মন্ত্রীপরিষদ। এছাড়াও অমাত্যদের হাতে রাজকাজের দায়িত্ব থাকত। টানা যুদ্ধ করে চলার কারণে হর্ষের সেনাবাহিনীও ছিল বিরাট।

এই সমস্ত শাসনকাজের জন্য দরকারি সম্পদ আসত কর থেকে। জমিতে উৎপাদিত ফসলের $^{১}/_{৬}$ অংশ কর নেওয়া হতো। তাছাড়া বণিকদের থেকে কর আদায় করা হতো। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বিনা করে জমি দান করা হতো।

প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে গুপ্ত শাসনের কাঠামোই হর্ষের আমলেও দেখা যায়। সম্ভবত শাসনের কাজ চালানোর জন্য মন্ত্রীদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি পরিষদ তাঁকে সাহায্য করত। দূরের প্রদেশগুলি শাসন করতেন সামন্ত রাজা বা রাজার কোনো প্রতিনিধি। প্রতিটি *প্রদেশ* বা *ভুক্তি* কয়েকটি *বিষয়* বা *জেলায়* বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থায় সবচাইতে নীচে ছিল গ্রামগুলি।

হর্ষের মৃত্যুর পর পুষ্যভূতি শাসন লোপ পায়। বিভিন্ন ছোটো ছোটো শাসকরা হর্ষের অধীনের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয়।

টুকরো কথা

বাণভট্টের হর্ষচরিত

বাণভট্ট হর্ষবর্ধনকে নিয়ে **হর্ষচরিত** কাব্য লেখেন। এটি আদতে একটি প্রশস্তি কাব্য। অর্থাৎ এই কাব্যে হর্ষের কেবল গুণগান করা হয়েছে। পাশাপাশি পুষ্যভূতিদের রাজত্ব ও তার ইতিহাস আলোচনা করেছেন বাণ। হর্ষের গুণগান করতে গিয়ে তাঁর বিরোধীদের ছোটো করেছেন বাণ। যেমন, রাজা শশাঙ্ককে অনেকভাবে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হর্ষচরিত শেষ হয়েছে। হর্ষচরিত আসলে হর্ষবর্ধনের আংশিক জীবনী। তবে শুধু গুণগানের জন্য এটিকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেওয়া মুশকিল।

টুকরো কথা

সুয়ান জাং-এর বর্ণনায় হর্ষবর্ধন, বৌদ্ধ সম্মেলন ও প্রয়াগের মহাদান

সপ্তম শতকের প্রথমভাগে চিনা বৌদ্ধ ভিক্ষু সুয়ান জাং ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন **সি-ইউ-কি** গ্রন্থে। সুয়ান জাং-এর লেখায় হর্ষবর্ধনের প্রসঙ্গে অনেক কথা আছে। তবে হর্ষের প্রতি সুয়ান জাং-এর পক্ষপাতিত্ব ছিল। হর্ষের নানা গুণগান করেছেন তিনি। তাঁর বেশ কিছু বর্ণনা বাস্তব বলে মনে হয় না।

সুয়ান জাং কনৌজে অনেকগুলি বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। তার পাশাপাশি ছিল দেবমন্দির। সুয়ান জাং হর্ষের বৌদ্ধ ধর্মের প্রীতির কথাই বেশি বলেছেন। অন্যদিকে বাণভট্টের লেখায় হর্ষকে শিবভক্ত বলে বলা হয়েছে।

সুয়ান জাং লিখেছেন, হর্ষবর্ধন প্রতি বছর একটা বৌদ্ধ সম্মেলন আয়োজন করতেন। সেখানে একুশ দিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলত। যারা ভালো কাজ করত তাদের পুরস্কার দেওয়া হতো। খারাপ কাজের জন্য রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। প্রয়াগে হর্ষের মহাদানক্ষেত্র ও উৎসব নিয়েও লিখেছেন সুয়ান জাং। মহাদানক্ষেত্রে বুদ্ধের ও শিবের মূর্তি বসানো হতো। আট দিন ধরে নানা জিনিস দান করা হতো। তার ফলে নাকি হর্ষের পাঁচ বছরের জমানো সব সম্পদ শেষ হয়ে যেত। সব দান করে দিয়ে হর্ষ কেবল একটা পুরোনো পোশাক পরতেন। তারপর বুদ্ধের পুজো করে উৎসব শেষ হতো। সুয়ান জাং শুনেছিলেন হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বছরে এই উৎসব করতেন।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো :

১.১) সেলুকাস ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মধ্যে চিরকাল শত্রুতা ছিল।

১.২) মৌর্য আমলে মেয়েরাও মহামাত্যের দায়িত্ব পেতেন।

১.৩) কুষাণরা এদেশেরই মানুষ ছিলেন।

১.৪) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তাব্দ গোনা চালু করেন।

২। নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো :

২.১) বিবৃতি : অশোক তাঁর সাম্রাজ্যে পশুহত্যা বন্ধ করেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ১- তাঁর রাজ্যে পশুর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

ব্যাখ্যা : ২- ধম্মের অনুসরণ করার জন্য ।

ব্যাখ্যা : ৩- পশুবাণিজ্য বাড়ানোর জন্য।

২.২) বিবৃতি : কুষাণ সম্রাটরা নিজেদের মূর্তি দেবকুলে রাখতেন।

ব্যাখ্যা : ১- তাঁরা ছিলেন দেবতার বংশধর।

ব্যাখ্যা : ২- তাঁরা প্রজাদের সামনে নিজেদের দেবতার মতোই সম্মাননীয় বলে হাজির করতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- তাঁরা দেবতাকে খুব ভক্তি করতেন।

২.৩) বিবৃতি : গুপ্ত সম্রাটরা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন।

ব্যাখ্যা : ১- উপাধিগুলি শুনতে ভালো লাগত।

ব্যাখ্যা : ২- উপাধিগুলি প্রজারা দিত।

ব্যাখ্যা : ৩- সম্রাটরা এর মাধ্যমে নিজেদের বিরাট ক্ষমতাকে তুলে ধরতেন।

২.৪) বিবৃতি : সুয়ান জাং চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ১- ভারতীয় উপমহাদেশে বেড়ানোর জন্য।

ব্যাখ্যা : ২- হর্ষবর্ধনের শাসন বিষয়ে বই লেখার জন্য।

ব্যাখ্যা : ৩- বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আরও পড়াশোনা করার জন্য।

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৩.১) কলিঙ্গযুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গে অশোকের ধম্মের কী সম্পর্ক? ধম্ম তাঁর শাসনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?

৩.২) মৌর্য সম্রাটরা গুপ্তচর কেন নিয়োগ করতেন?

৩.৩) মৌর্য সম্রাট ও গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার তুলনা করো।

৪। হাতেকলমে করো :

মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত আমলের মুদ্রাগুলির তুলনা করলে কী কী মিল-অমিল দেখা যাবে?

৭

অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

রাজা-সম্রাটদের কথা শুনতে ভালো লাগে। তবে খালি রাজাদের কাজকর্মের কথাই শুনতে ভালো লাগে না রুবির। দাদুকে তাই পাকড়াও করল সবাই। আজ ওদের সবাইকে গল্প শোনাতে হবে। তবে রাজার বা রূপকথার গল্প নয়। এমনি লোকজনের গল্প। দাদু বললেন, বেশ তাই হোক। বলেই সটান বসে গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলেন। ওরা চিরকাল/ টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল। / ওরা মাঠে মাঠে/ বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।/ ওরা কাজ করে/ নগরে প্রান্তরে। দাদুর মুখে আবৃত্তি শুনছে সবাই। আবার বললেন দাদু, রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;/ জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে, —ওমা হঠাৎ গল্পের কথায় কবিতা চলে এল। এর মানে কী? দাদু বুঝিয়ে বললেন, এই কবিতায় *ওরা* মানে সাধারণ মানুষ। তারা চিরদিনই নিজের নিজের কাজ করে যায়। ক্ষেতে ফসল ফলায়। নৌকা চালায় নদীতে। নগর বা গ্রাম সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষের কাজকারবার চলতে থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্য বেশি দিন থাকে না। একজন শাসক হয়। বেশ কিছু বছর তার শাসন চলে। তারপর অন্যজন শাসক হয়ে বসে। একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অন্য সাম্রাজ্য তৈরি হয়। রাজছত্র সেই সাম্রাজ্যের প্রতীক। তাই *রাজছত্র* সাম্রাজ্যের সঙ্গেই ভেঙে যায়। সাম্রাজ্য থাকলে যুদ্ধও থাকে। কিন্তু সেইসব যুদ্ধও একদিন থেমে যায়। *রণডঙ্কা* মানে যুদ্ধের (রণ) বাজনা (ডঙ্কা)। সেসবের শব্দ আর শোনা যায় না।

যুদ্ধে জিতে জয়ীরা উঁচু করে স্তম্ভ বানায়। সেই স্তম্ভও একসময় ভেঙে পড়ে। না ভাঙলেও তার জৌলুস কমে যায়। অর্থাৎ সম্রাট, সাম্রাজ্য, যুদ্ধ, যুদ্ধে জয় সব একসময় ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু, চাষি তার ক্ষেতে বীজ বোনে। পাকা ফসল কাটে। সেই ফসল একসময়ে সম্রাটের পেট ভরাত। কারণ সম্রাট তো নিজে চাষ করতেন না। আজও চাষির ফলানো ফসল আমাদের পেট ভরায়।

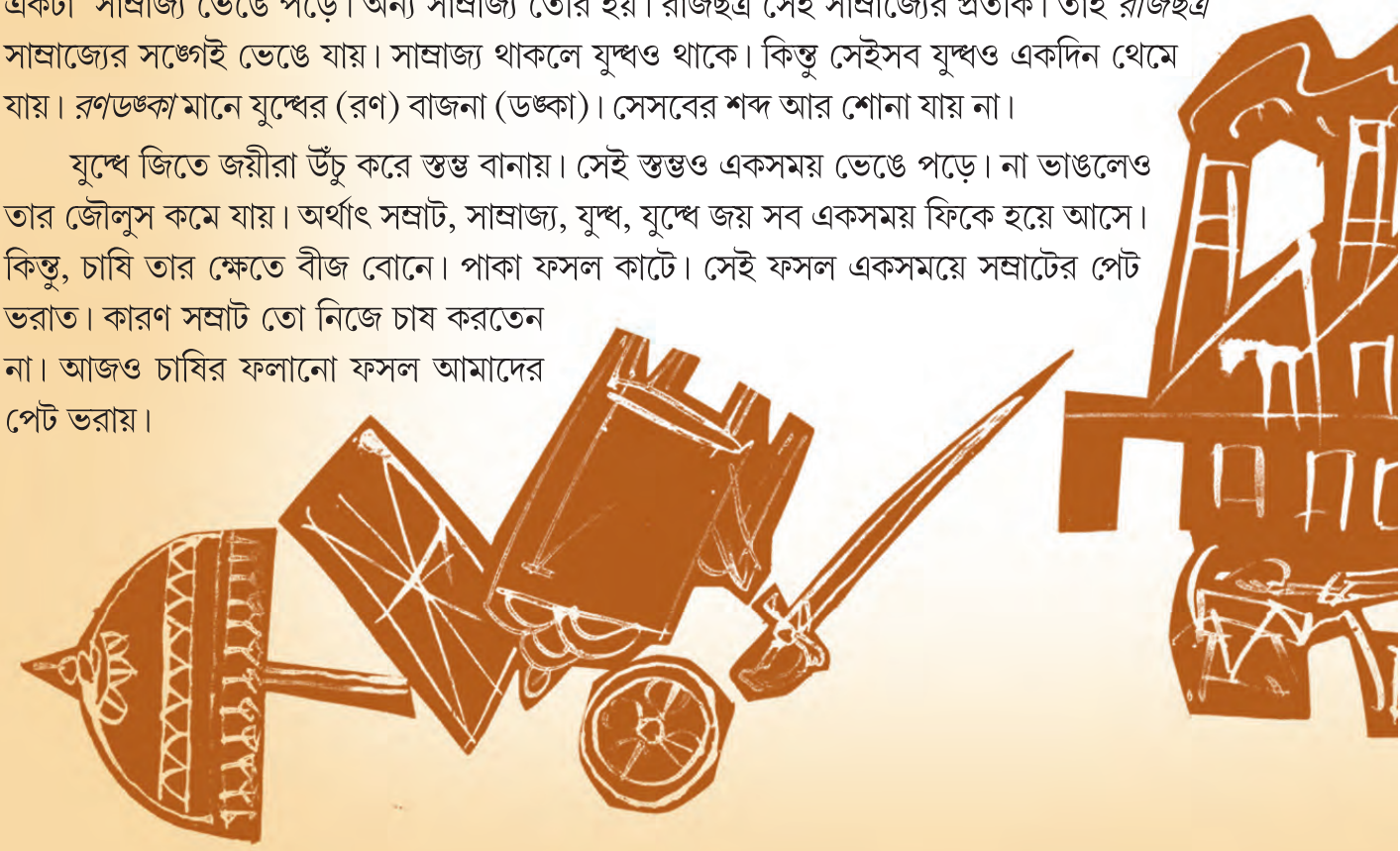

এই বলে দাদু ফের আবৃত্তি করলেন। শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ— 'পরে/ওরা কাজ করে।/—শেষে বললেন, আজ সম্রাটও নেই, সাম্রাজ্যও নেই। কিন্তু চাষি আছে, কারিগর শিল্পীরা আছে। এরাই সমাজ চালায়। এরাই খাদ্য উৎপাদন করে। আমাদের রোজকার প্রয়োজন মেটায়। আমরা সবাই এই 'ওরা'-র ভিতরে পড়ি। আমরা সাধারণ মানুষ। কিন্তু আমাদের সবার নাম বিখ্যাত নয়। রাজা সম্রাটদের নাম অনেকেই জানে। কিন্তু সম্রাট অশোকের রথ চালাতেন কে? তার নাম কেউ জানে না। এসব শুনে অরুণ বলল, সত্যি এটা ভারি অন্যায়! রাজাদের কথা কত ফলাও করে বলা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা তো ঢাক পিটিয়ে বলা হয় না। তাদের নামও আমরা জানতে পারি না। তখন সবাই মিলে ঠিক করল স্কুলে গিয়ে স্যারকে বলবে এসব।

পরদিন স্যার সব শুনলেন। বললেন, এবারে তাহলে প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের কথাই আলোচনা হোক । সাধারণ মানুষকে নিয়েই সমাজ তৈরি হয়। তাদের কাজকর্মের ফলেই সম্পদ তৈরি হয়। সেই সম্পদে চলত রাজার, সম্রাটের শাসন। এবারে তাহলে সেই সমাজ, অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের কথাই শুরু হোক। তোমরা তো খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ষোলোটা মহাজনপদের কথা জেনেছ। ঐ সময় থেকেই শুরু করা যাক।

৭.১ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক : ষোড়শ মহাজনপদের আমল

মহাজনপদগুলির আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনীতি ও সমাজও বদলে গিয়েছিল। জনপদ বলতে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অঞ্চলকেও বোঝায়। ফলে জনপদ ও মহাজনপদে কৃষিজীবী জনবসতিও ছিল। মহাজনপদগুলিতে রাজকর্মচারী ও যোদ্ধাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় সম্পদ কৃষি থেকেই আসত। বেশিরভাগ মহাজনপদ গঙ্গা উপত্যকায় ছিল। ঐ অঞ্চলের নদীগুলিতে বছরের বেশিরভাগ সময়ই জল থাকত। তার সঙ্গে ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি। এর ফলে ঐ অঞ্চলের উর্বর মাটি চাষের পক্ষে ভালো ছিল।

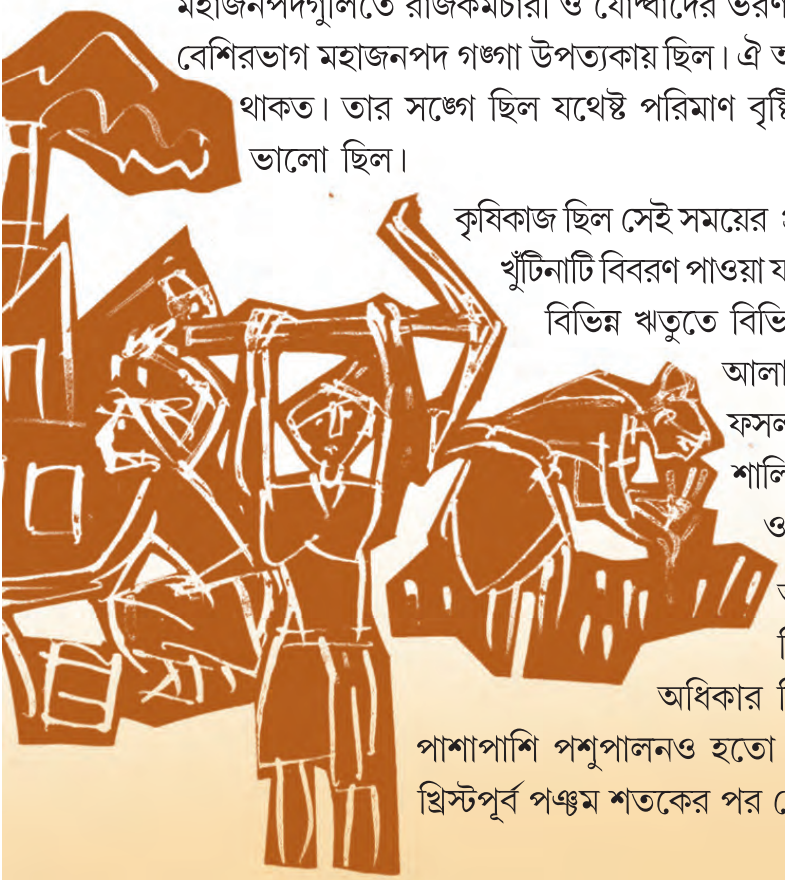

কৃষিকাজ ছিল সেই সময়ের প্রধান জীবিকা। সেযুগের বিভিন্ন লেখায় চাষের কাজের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। উর্বরতা অনুযায়ী জমির নানারকম ভাগ করা হতো। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলানো হতো। ঋতু অনুযায়ী ফসলগুলির আলাদা আলাদা নামও ছিল। কৃষিতে ধানই ছিল প্রধান ফসল। ধানের মধ্যে সেরা ছিল শালি ধান। মগধ অঞ্চলে শালি ধানের চাষ বেশি ছিল। কৃষিজ ফসলের মধ্যে গম, যব ও আখের ফলনও হতো।

আগের মতো জমির উপর সবার সমান অধিকার আর ছিল না। কিছু সংখ্যক মানুষের হাতে অনেক জমির অধিকার ছিল। এর পাশাপাশি ছিল জমিহীন কৃষক। কৃষির পাশাপাশি পশুপালনও হতো। কৃষির জন্য গবাদি পশুর প্রয়োজন ছিল। সেজন্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পর থেকে গবাদি পশু বলি দেওয়া কমতে থাকে।

এই সময়ে কারিগরি শিল্প ও নানারকম পেশার বিবরণও পাওয়া যায়। এই সময়ের লোহার জিনিসপত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ছিল যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। তাছাড়া দা, কুড়ুল, কুঠার ও কিছু লাঙলের ফলাও পাওয়া গেছে। লোহার কুড়ুল ও কুঠার দিয়ে সহজেই ঘন জঙ্গল কাটা যেত। তার ফলে বসতি ও কৃষি জমি বাড়ানো সহজ হয়। মহাজনপদগুলি যুদ্ধের কাজে লোহার অস্ত্রের ব্যবহার করতো। মধ্যগঙ্গা উপত্যকায় বেশ কয়েকটি অঞ্চলে আকরিক লোহা পাওয়া যেত। দক্ষিণ ভারতে লোহার জিনিসপত্র কৃষিকাজে ব্যবহার হতো। তবে লোহার তৈরি লাঙলের ফলার ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে এই সময় হয়নি। বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে খুব বিখ্যাত ছিল বারাণসী। গয়না বানানোর শিল্পও এইসময় লক্ষ করা যায়। দামি ও আধাদামি নানারকম পাথর ও পুঁতির গয়না বানানোর কাজে ব্যবহার হতো।

কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি বাণিজ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। এই সময়ে বাণিজ্যের উন্নতি হয়। মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ধনী বণিকদের পাশাপাশি ছোটো দোকানদার ও ব্যবসায়ীও ছিল। অনেক গোরুরগাড়ি বোঝাই করে দূরদূরান্তে বাণিজ্যে যেতেন কিছু বণিক। গোরু ও ঘোড়ার বাণিজ্য চলত। উত্তর ভারতে স্থলপথে ও নদীপথে বাণিজ্য করা সহজ ছিল। সেই তুলনায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য হতো কম। ব্যবসা করতে গেলে ধার দেওয়া-নেওয়া ছিল জরুরি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে তার জন্য ছাড় দেওয়াও হয়েছিল। তবে ধার নিয়ে তা শোধ দেওয়া উচিত বলে মনে করা হতো। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এই সময় ধাতুর মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। *কার্ষাপণ* ছিল বহু প্রচলিত এক ধরনের মুদ্রা। গোল ও চৌকো আকৃতির অনেক রুপোর মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশ থেকে বোঝা যায় ব্যবসাবাণিজ্যও এইসময় বেড়েছিল। তবে বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এই সময়ের মুদ্রা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম নগর দেখা গিয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায়। তাই তাকে বলে প্রথম নগরায়ণ। তার প্রায় হাজার বছরেরও পরে আবার নগর গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই নগরায়ণ মূলত হয়েছিল উত্তর ভারতে বিশেষত গঙ্গা উপত্যকায়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ হওয়া এই নগরায়ণ *দ্বিতীয় নগরায়ণ* বলে পরিচিত। সেযুগের লেখায় গ্রাম ও নগরের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বেশিরভাগ মহাজনপদের রাজধানীগুলিই ছিল বিখ্যাত নগর। নগরগুলি ছিল পাথর, মাটি বা ইট দিয়ে বানানো প্রাকার দিয়ে ঘেরা।

নগরগুলি গ্রামীণ বসতির তুলনায় আকারে বড়ো ছিল। শাসন ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেরা প্রধানত নগরে থাকত। এরা কেউই নিজেরা নিজেদের

টুকরো কথা

উত্তর ভারতের কালো চকচকে মাটির পাত্র

গৌতম বুদ্ধের সময়ে একরকম মাটির পাত্র বানানোর শিল্প খুব উন্নত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা যেগুলিকে **উত্তর ভারতের কালো চকচকে মাটির পাত্র** বলেন। এই পাত্রগুলি আগের আমলের ধূসর মাটির পাত্রগুলির থেকেও উন্নত। খুব ভালো মানের মাটি দিয়ে এই পাত্রগুলি তৈরি হতো। কুমোরের চাকার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এই পাত্র বানানো সহজ হয়। পাত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলি আয়নার মতো চকচকে। মাটির পাত্রগুলিকে ভালো চুল্লির আঁচে পুড়িয়ে কালো করা হতো। পোড়ানোর পর পাত্রগুলি পালিশ করা হতো। এই মাটির পাত্রের নজির হিসাবে থালা ও নানা রকমের বাটি পাওয়া গেছে।

খাদ্য উৎপাদন করত না। ফলে এদের জন্য নিয়মিত খাদ্য আসত গ্রাম থেকে। তাই নগরগুলো গড়ে উঠত গ্রামীণ এলাকার কাছাকাছি। নতুন নগর তৈরি হওয়ার ফলে বেশ কিছু নতুন জীবিকারও খোঁজ পাওয়া যায়। এই সময় উত্তর ভারতে ধোপা, নাপিত ও চিকিৎসকের (বৈদ্য) জীবিকা খুব পরিচিত ছিল।

পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের পরে। নারীদের শিক্ষার সুযোগ ক্রমেই কমে গিয়েছিল। বালিকা বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সমাজে বেড়ে যায়। তবে নারীদের প্রতি বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তুলনায় কিছুটা উদার ছিল।

৭.২ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ : মৌর্য আমল

মৌর্য আমলেও সমাজে ধনী ও দরিদ্র এবং অন্যান্য ভেদাভেদ ছিল। নারীদের সাধারণ অবস্থা মৌর্য আমলেও আগের মতো ছিল। তবে ঘরকন্নার কাজের বাইরেও নারীরা কয়েকটি পেশায় যোগদান করতে পারতেন। সুতো উৎপাদনের কাজে নারী শ্রমিকদের কথা জানা যায়। গুপ্তচর ও রাজকর্মচারী হিসাবেও নারীদের নিয়োগ করা হতো।

মৌর্য আমলেও অর্থনীতি মূলত কৃষির উপরেই নির্ভর করত। বহু নদী থাকার জন্য ও বছরে অন্তত দু-বার বর্ষার ফলে জমি উর্বর থাকত। নানারকম ও পরিমাণে অনেক ফসলের কথা জানা যায়। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আবাদি এলাকা বাড়ানোর দিকেও সেযুগে নজর দেওয়া হতো।

কারিগর ও বণিকদের কাজের তদারকি করত রাষ্ট্র। খনি ও খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার ছিল একচেটিয়া। খনিগুলির দেখভালের জন্য রাজকর্মচারী বহাল করা হতো। নুনকেও খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ধরা হতো। সুতো ও মুদ্রা তৈরির শিল্পেও রাষ্ট্রের তদারকি চলত। তবে সবক্ষেত্রে এই তদারকি একই রকম ছিল না।

ব্যবসার নানা দিক সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার জন্য আলাদা রাজকর্মচারী থাকত। মৌর্য আমলে রাজধানীর সঙ্গে সাম্রাজ্যের নানা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল। নিয়মিত রাজপথের দেখাশোনা করার জন্য রাজকর্মচারী থাকত। পথের পাশে দূরত্ব ও দিক বোঝানোর ফলক লাগানো হতো। সেগুলি ছিল অনেকটা আজকের মাইল ফলকের মতো।

ছবি. ৭.১:
প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের নানারকম মুদ্রা

টুকরো কথা

মেগাস্থিনিসের চোখে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

মেগাস্থিনিস ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজের চারটি বর্ণের কথা জানতেন না। তবে পেশাদার বা বৃত্তিজীবী নানা জাতি তিনি দেখেছিলেন। তাঁর মতে, ভারতের জনসমাজ সাতটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। যেমন— ব্রাহ্মণ বা পণ্ডিত, কৃষক, পশুপালক ও শিকারি, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, গুপ্তচর বা পর্যটক এবং সচিব বা মন্ত্রী। মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, ভারতে দাসপ্রথা ছিল না।

মেগাস্থিনিসের মতে, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা নগরে বাস করত না। তারা কখনও অন্য কোনো জাতিকে আক্রমণ করে না। অপর জাতিরাও ভারতবাসীদের আক্রমণ করত না। আলেকজান্ডারই একমাত্র যিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মেগাস্থিনিসের মতে, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি। তবে মেগাস্থিনিসের সব কথাগুলি কিন্তু ঠিক নয়।

ভেবে দেখো

বৈদিক সমাজের সঙ্গে মৌর্য আমলের সমাজের কী কী মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়া যায়?

মৌর্য আমলে সাধারণ পুরুষেরা অনেকটা আজকের ধুতি-চাদরের মতো পোশাক পরতেন। মহিলারা পোশাকের উপর চাদর বা ওড়না ব্যবহার করতেন। ধনী ও রাজপরিবারের নারী-পুরুষ দামি পোশাক পরতেন। সুতির কাপড়ের চাহিদা সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল। পশম ও রেশমের কাপড়ের ব্যবহার ছিল বলেও জানা যায়। পুরুষেরা অনেকেই মাথায় পাগড়ি পরতেন। দামি পাথর ও সোনার তৈরি গয়না পরতেন ধনীরা।

মাটি, পাথর, ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরি হতো ঘরবাড়ি। ঘরের ভিতরে ও বাইরে পলেস্তারা লাগানো হতো। অনেকে ঘরের দেয়ালে ছবি আঁকাতেন। আসবাবপত্রের মধ্যে খাট বা চৌকি, মাদুর, তোশক, চাদর, বালিশ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

৭.৩ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত : কুষাণ আমল

অর্থনীতি ও সমাজের নিরিখে এই পাঁচশো বছরে বেশ কিছু বদল লক্ষ করা যায়। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়েছিল এই সময়। উত্তর ভারতে আগের মতো কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ধান, গম, যব, আখ, কার্পাস ছিল প্রধান ফসল। দাক্ষিণাত্যের কালোমাটিতে তুলোর চাষ বেশি হতো। কেরালায় গোলমরিচের ফলন ছিল বিখ্যাত। কৃষিকাজে নানান রকমের উপকরণের

ব্যবহার এই সময় দেখা যায়। মাটি খুঁড়ে লোহার লাঙল, কোদাল, কুঠার, দা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই সময়ে সমস্ত জমির উপর সম্রাটের মালিকানা ছিল না। বরং অনেক জমিরই মালিক ছিলেন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি।

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের জলসেচ ব্যবস্থা

কৃষিকাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন ভালো সেচ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শাসকরা সেদিকে নজর দিতেন। নদীর জল সেচের মাধ্যমে ক্ষেতে পৌঁছে দিতে নানান উদ্যোগ নেওয়া হতো। জলসেচ প্রকল্পগুলিকে **সেতু** বলা হতো। এই সেতু ছিল দু-ধরনের। এক ধরনের সেতু প্রাকৃতিক জলের উৎসকে ভিত্তি করে থাকত। আবার কৃত্রিম উপায়ে অন্য এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় জল আনিয়েও সেতু বানানো হতো। সেতুর জল ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের জলকরও দিতে হতো। ধনী ব্যক্তিরাও নিজেদের উদ্যোগে জলসেচ প্রকল্প তৈরি করতেন।

কুষাণ আমলে সেতুর ক্ষতি করলে শাস্তি দেওয়ার কথাও জানা যায়। কূপ বা জলাশয় বানিয়ে দেওয়া ভালো কাজ বলে ধরা হতো। সেচকাজে একধরনের যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। যন্ত্রটি চাকার মতো, তার গায়ে ঘটি লাগানো থাকত। বড়ো কূপ বা জলাশয়ে যন্ত্রটি বসানো হতো। চাকাটি ঘুরিয়ে ঘটিগুলো দিয়ে কূপের জল বাইরে আনা হতো। ঐ যন্ত্র বানানো ও সারানোর কারিগরও ছিল।

গুপ্ত আমলে কৃষিকাজ বাড়ার সঙ্গে সেচব্যবস্থার উন্নতির যোগাযোগ দেখা যায়। তাম্রলেখগুলিতে গ্রামে পুকুর বা তড়াগ খোঁড়ার কথা পাওয়া যায়। সেচের উন্নতিতে রাজা নজর দিতেন। পাশাপাশি ধনী ব্যক্তিরাও নিজেদের উদ্যোগে জলসেচের ব্যবস্থা করে দিতেন।

সুদর্শন হ্রদ

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে রাজকীয় উদ্যোগে জলসেচ ব্যবস্থার একটা প্রধান উদাহরণ সুদর্শন হ্রদ। মৌর্য আমল থেকে গুপ্ত আমল পর্যন্ত ঐ হ্রদের ব্যবহার ছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে ঐ হ্রদটি বানানো হয়েছিল। **ওয়াড়** কথার মানে শহর। এটি একটি নদীভিত্তিক বড়ো মাপের সেচ প্রকল্প (সেতু)। অশোকের শাসনকালে সেচ প্রকল্পটিতে কয়েকটি সেচ খালও যোগ করা হয়। শকশাসক রুদ্রদামন ঐ হ্রদটির সংস্কার করেন (১৫০ খ্রিস্টাব্দ)। বাঁধটিকে আরো বড়ো ও শক্ত করা হয়। এই পুরো কাজের বর্ণনা রুদ্রদামন জুনাগড়ে একটি শিলালেখতে খোদাই করিয়েছিলেন। গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের শাসনের প্রথম বছরেই আবার হ্রদটি মেরামতির দরকার হয় (১৩৬ গুপ্তাব্দ বা ৪৫৫/৪৫৬ খ্রিস্টাব্দ)। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত সুদর্শন হ্রদের টানা ব্যবহার হয়েছিল।

এই পাঁচশো বছরে উপমহাদেশের ভিতরে ও বাইরে বাণিজ্যের বিকাশ দেখা যায়। বাণিজ্যের উন্নতিতে জলপথ ও স্থলপথগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিদেশের বাজারে উপমহাদেশের মসলিন ও অন্যান্য কাপড়ের চাহিদা ছিল। তাছাড়া হিরে, বৈদূর্য, মুক্তো ও মশলার কদর বিদেশের বাজারে ছিল। চিনের

রেশম ছিল আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। কাচের তৈরি জিনিসপত্রও বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। এই আমলে কারিগরি শিল্প ও পেশার বৈচিত্র্য অনেক বেড়েছিল। বারাণসী ও মথুরা দামি কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচীন বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড় মসলিনের কদর ছিল।

টুকরো কথা

নতুন নতুন নগর

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রধানত উত্তর ভারতে নগরায়ণ দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে এই আমলে প্রায় পুরো উপমহাদেশ জুড়ে নতুন নগর গড়ে ওঠে। তক্ষশিলার সিরকাপ-এ প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে একটি নগরের খোঁজ পেয়েছেন। তার থেকে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নগরগুলি বেশ উন্নত ছিল। কুষাণ আমলে গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে প্রাকার ঘেরা মথুরা ছিল বিখ্যাত নগর। ঐ নগরে কাদামাটির ইট ও পোড়ানো ইটের ব্যবহার দেখা যায়। এই সময় মথুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। মথুরার ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্প ছিল বিখ্যাত।

মৌর্য আমলে প্রাচীন বাংলাতে মহাস্থানগড় ও বাণগড়ে নগর ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে এইসময় তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি নগরও গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ওড়িশা এলাকার শিশুপালগড়ে নগরের খোঁজ পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতেও এই সময় নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠে। কাবেরী নদীর বদ্বীপে কাবেরীপট্টিনম ছিল বিখ্যাত বন্দর-নগর।

এই আমলে বর্ণাশ্রম ও চতুরাশ্রম প্রথা ছিল কঠোর। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার থেকে অনেক গোষ্ঠী এই সময় ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। ধীরে ধীরে এদের অনেকেই ভারতীয় সমাজে মিশে যায়।

মৌর্য আমলের মতো এই সময়েও অবসর সময় কাটানোর নানান উপায় ছিল। নাচ, গান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। পাশাপাশি জাদুর খেলা ও নানান রকম দড়ির কসরত সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিত। পাশা খেলা, শিকার, রথের দৌড়, কুস্তি প্রভৃতি ছিল ধনী মানুষদের অবসর কাটানোর উপায়। বড়ো বড়ো উৎসবে সমস্ত মানুষের মধ্যে বিনা পয়সায় খাবার ও পানীয় বিলি করা হতো।

সমাজ জীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার। বাবা ছিলেন পরিবারের প্রধান। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে মায়ের নাম সন্তানের নামের সঙ্গে যুক্ত হতো। সাতবাহন শাসকদের অনেকের নামই তার প্রমাণ। কিন্তু, সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের নীচে। পরিবারে মেয়ের বদলে ছেলে জন্মালে আনন্দ বেশি হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে ছিল। অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কথা বলা হতো।

ছবি. ৭.২:
সাতবাহন আমলের মুদ্রা

টুকরো কথা

সাতবাহন আমলে দক্ষিণ ভারতের গ্রাম-জীবন

খ্রিস্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতক নাগাদ সাতবাহন-রাজা হাল একটি বই সংকলন করেন। প্রাকৃত ভাষায় লেখা ঐ বইটির নাম **গাথা সপ্তশতী** (সাতশোটি গাথার সংকলন)। এই বইতে সেই সময়ের দাক্ষিণাত্যের গ্রাম জীবনের নানান দিক সম্পর্কে জানা যায়। বইয়ের সমস্ত চরিত্রই গ্রামের সাধারণ মানুষ।

গ্রামবাসীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। ধান, তেলের বীজ, কার্পাস ও শন ছিল প্রধান ফসল। গ্রামের বাড়িগুলি খড় দিয়ে ছাওয়া ও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। পুকুর, ফুলের বাগান, ও বটগাছ সব গ্রামেই দেখা যেত। গ্রামে নানারকম গৃহপালিত পশু-পাখি ছিল।

গ্রামে চওড়া ও সরু— দু-রকম রাস্তাই ছিল। বর্ষায় রাস্তাগুলি কাদায় ভরে যেত। গ্রামের শাসন ছিল গ্রামণীর হাতে। চুরি-ডাকাতি থেকে টাকা পয়সা বাঁচাতে অনেকে সেগুলি মাটির নীচে পুঁতে রাখত। বিভিন্নরকম বাজনা ও ছবি আঁকার চল ছিল গ্রামগুলিতে। উৎসবের সময় গ্রামের লোকেরা নাচ, গান ও বাজনায় মেতে উঠত। সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার পুজো হতো মন্দিরে। গ্রামে বৌদ্ধ ধর্মেরও প্রচলন ছিল।

৭.৪ আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত: গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমল

এই সময়কালেও কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ধান ছিল প্রধান ফসল। আখ, তুলো, নীল, সরষে ও তৈলবীজের চাষ হতো। দক্ষিণ ভারতে সুপুরি, নারকেল ও নানারকম মশলা চাষের কথা জানা যায়। সেসময় বিভিন্ন লেখায় জমির নানারকম ভাগ পাওয়া যায়। আবাদি জমিকে বাস্তুজমি ও অরণ্য থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হতো। এইসময় প্রাচীন বাংলায় জমির মাপ ও আয়তনের বিভিন্ন হিসেবের কথা জানা যায়।

গুপ্ত আমলে বাংলায় পাওয়া তাম্রলেখগুলিতে জমি কেনাবেচার কথা জানা যায়। বহু ক্ষেত্রে একটি জমি প্রথমে কেনা হতো। তারপরে ঐ জমি ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধবিহারকে দান করা হতো। ঐ দান করা জমিগুলি সাধারণত করের আওতায় পড়ত না। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই জমিদানকে *অগ্রহার ব্যবস্থা* বলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জমিতে ব্যক্তি মালিকানা আরো বেড়েছিল। দান পাওয়া জমিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো। ঐ জমির উৎপাদন থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খরচা চালাতেন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা। অনেক অনাবাদি জমিকে দান হিসেবে দেওয়া হতো। সেই জমিগুলিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো। তার ফলে সেগুলি আবাদি জমি হয়ে উঠত। অর্থাৎ অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে কৃষিকাজ বেড়েছিল।

এই সময়ে লোহার জিনিস তৈরির শিল্প খুব উন্নত ছিল। দিল্লির কুতুব মিনারের পাশে একটা লোহার স্তম্ভ আছে। সেটা খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে তৈরি। অথচ আজও সেটাতে মরচে পড়েনি। তাছাড়া এই আমলে লেখক বা করণিক ও চিকিৎসক পেশার কথা জানা যায়।

গুপ্ত আমলে দূরপাল্লার বৈদেশিক বাণিজ্যে খানিক ঘাটতি দেখা যায়। এর একটা কারণ ছিল হূণ আক্রমণ (এই বিষয়ে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। এর ফলে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। তবে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে উপমহাদেশের বাণিজ্য জারি ছিল। পূর্ব উপকূলের তাম্রলিপ্ত বন্দরের খ্যাতি এই সময়ে আরো বাড়ে। তামিলনাড়ুর কাবেরীপট্টিনম বন্দরেও নিয়মিত দূরপাল্লার বাণিজ্য হতো।

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে কারিগর

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে নানা রকম কারিগরি শিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। কারিগররা অনেক সময় একেকটা অঞ্চলে জমায়েত হয়ে বাস করতেন। কুষাণ আমলে কারিগরি শিল্পের বৈচিত্র্য বেড়েছিল। কুমোর, কামার, ছুতোর ও তাঁতির কথা জানা যায়। পাশাপাশি অন্যান্য কারিগরও ছিল। যেমন, সোনার গয়না বানাত সুবর্ণকার। হাতির দাঁতের জিনিসপত্র বানাত দন্তকার। তাঁতিরা কাপড় বুনতো। কাপড় রং করত রঙ্গকার। পোশাকে সূচিশিল্পের কাজ করত সূচিকার।

টুকরো কথা

কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংঘ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই ব্যবসাবাণিজ্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি তৈরি হয়েছিল ব্যবসায়ী ও কারিগরদের সংঘ। সংঘগুলি কারিগরি ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ মেটাত। তাছাড়া পেশাগত নিরাপত্তার দিকেও খেয়াল রাখত সংঘগুলি। জিনিসের গুণমান ও দাম ঠিক রাখাও সংঘের কাজের আওতায় পড়ত। সংঘগুলি **শ্রেণি, গণ** ইত্যাদি নামেও পরিচিত ছিল।

কুষাণ যুগে এক একটি পেশাকে কেন্দ্র করে আলাদা গ্রাম গড়ে উঠেছিল। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিজস্ব আইন মোতাবেক চলত। তবে গুরুতর গোলমাল দেখা দিলে রাজা বা সম্রাটরা ব্যবস্থা নিতেন। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিয়মিতভাবে

নগদ অর্থের লেনদেন করত। সমাজের বিভিন্ন মানুষ সেখানে আমানত অর্থ জমা রাখত। নগদ অর্থ ছাড়াও জমি, গাছ ইত্যাদি স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা হতো। সেই জমা আমানতের উপর সুদও দেওয়া হতো। ঐ আমানত অর্থ বিভিন্ন শিল্পে মূলধন হিসেবে দেওয়া হতো। এইভাবে শ্রেণি বা সংঘগুলি এক ধরনের ব্যাংকের মতোই কাজ করত। নর্মদা নদীর উত্তরের হিরের খনি নিয়ে কুষাণ, সাতবাহন এবং শক-ক্ষত্রপদের মধ্যে লড়াই চলেছিল।

গুপ্ত ও তার পরবর্তী আমলে সংঘগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বেড়েছিল। শ্রেণির কাজকর্মের তদারকির জন্য বেশকিছু কর্মচারী বহাল করার তথ্য পাওয়া যায়। নগরের নানা শাসনকাজেও ধনী বণিকদের ভূমিকা বাড়তে থাকে। এই আমলে বণিকরাও কারিগরদের মতো সংঘ বানাতে শুরু করেন। বণিকদের নিজস্ব সংগঠনকে **বণিকগ্রাম** বলা হতো।

ছবি. ৭.৩:
গুপ্ত আমলের বিভিন্ন মুদ্রা। এর মধ্যে একটিতে সমুদ্রগুপ্তের বীণা বাজানোর ছাপ রয়েছে। সেটি কোনটি?

গুপ্ত আমলে অনেক সোনার ও রুপোর মুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্ত রাজাদের চালু করা সোনার মুদ্রাকে *দীনার* ও *সুবর্ণ* বলা হতো। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে রুপোর মুদ্রা প্রথম চালু করা হয়। তার নাম ছিল *রূপক*। সোনার ও রুপোর মুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে বেশি ব্যবহার হতো। রোজকার কাজেকর্মে ব্যবহারের জন্য তামার মুদ্রাও চালু করেন গুপ্ত শাসকরা। তবে গুপ্তদের সময়েই দক্ষিণের বাকাটক শাসকরা কোনো মুদ্রা চালু করেননি। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সব জায়গায় মুদ্রার লেনদেন সমান ছিল না। তাছাড়া সমাজে কৃষিকাজ বাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের হার কমেছিল। এই সবের ফলে নগরগুলিও আগের থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাজে বর্ণাশ্রম চালু ছিল। তবে সবাই কঠোরভাবে সেসব মানত না। কিন্তু নীচুতলার মানুষদের প্রতি ব্রাহ্মণদের মনোভাব বিশেষ বদলায়নি। একই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের আলাদা শাস্তি হতো। ধার করলে শূদ্রকে অনেক চড়া হারে সুদ দিতে হতো। তবে এই আমলে শূদ্ররা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য করতে পারত। অবশ্য সবথেকে খারাপ অবস্থা ছিল চণ্ডালদের। তারা গ্রাম বা নগরের মধ্যে থাকতেও পারত না। এমনকি ব্রাহ্মণরা তাদের ছোঁয়াছুয়ি এড়িয়ে চলত।

এই আমলেও পরিবারের প্রধান ছিলেন বাবা। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি চালু ছিল। এই সময়ে অবশ্য মেয়েরা বিয়ের সময় কিছু সম্পদ পেতেন। ঐ সম্পদের উপরে কেবল ঐ মেয়েরই অধিকার ছিল। একে *স্ত্রীধন* বলা হতো। মেয়েরা নিজের ইচ্ছামতো ঐ সম্পদের ব্যবহার করতেন । তবে স্ত্রীধন প্রথা সমস্ত বর্ণের মধ্যে চালু ছিল না।

টুকরো কথা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের খাবার-দাবার

প্রাচীন ভারতীয় উপ-মহাদেশে চাল, গম, যব ও শাকসবজি ছিল প্রধান খাবার। ধনীদের মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন বেশি ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজে দুধ ও দুধের তৈরি নানান রকম খাবারের ব্যবহার ছিল। গরিব মানুষেরা ঘিয়ের বদলে তেল ব্যবহার করত। তাছাড়া মটর, তিল, মধু, গুড়, নুন প্রভৃতি খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে নিরামিষ খাওয়া-দাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো। এমনকি সবরকম মাছ খাওয়ার উপরেও বিধিনিষেধ ছিল। দুধ ও নানান রকম ফলের রস থেকে তৈরি পানীয়ের ব্যবহার ছিল।

টুকরো কথা

ফাসিয়ান-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ফাসিয়ান চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখায় উপমহাদেশের মানুষ ও সমাজ বিষয়ে নানান কথা পাওয়া যায়। তবে তাঁর লেখায় কোথাও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা বলেননি তিনি।

ফাসিয়ান লিখেছেন, উপমহাদেশে অনেকগুলি নগর ছিল। মধ্য দেশের নগরগুলি ছিল উন্নত। সেখানে জনগণ সুখে বাস করত। তবে চণ্ডালরা নগরের বাইরে থাকত বলে তিনি জানিয়েছেন। যারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদেরকেই **চণ্ডাল** বলা হতো। এদেশের লোকেরা অতিথিদের যত্ন করত। বিদেশিদের যাতে কোনো কষ্ট না হয় তার দিকেও তারা খেয়াল রাখত। পাটলিপুত্র ছিল দেশের সেরা নগর। সেখানকার লোকেরা ছিল সুখী ও সম্পদশালী। ধনী বৈশ্যরা নগরের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন। বিনামূল্যে সেখান থেকে ওষুধ দেওয়া হতো। গরিবদের খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা সেখানে ছিল।

সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতবর্ষ **ইন-তু** নামে পরিচিত হয়েছে। তাঁর মতে ইন-তু-র লোকেরা নিজেদের দেশকে বিভিন্ন নামে ডাকে। দেশটির পাঁচটি ভাগ — উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য। ইন-তু-তে আশিটি রাজ্য আছে। প্রতিটি রাজ্যে নিজস্ব রাজা থাকলেও তারা বড়ো সম্রাটের অনুগত ছিল।

সুয়ান জাং ইন-তুকে মূলত গরমের দেশ বলেছেন। সেখানে নিয়মিত বৃষ্টি হয়। উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। দক্ষিণ অঞ্চল বনে ঢাকা। পশ্চিম অঞ্চলের মাটি পাথুরে ও অনুর্বর। ধান ও গম প্রধান কৃষিজ ফসল। জনগণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল।

শহরের বাড়িগুলি ইট ও টালি দিয়ে তৈরি হতো। বাড়ির বারান্দা তৈরি করা হতো কাঠ দিয়ে। গ্রামের বাড়িগুলির দেয়াল ও মেঝে ছিল মাটির। নানান রকম দামি ধাতু ও পাথরের ব্যাবসা চলত। শাসকরা জনগণের সুযোগ সুবিধের কথা মাথায় রাখতেন।

ভেবে দেখো

তোমরা সে আমলের খাবারের একটা তালিকা তৈরি করো। পাশাপাশি তোমরা এখন যেসব খাবার খাও তারও একটা তালিকা বানাও। সেই তালিকা দুটির তুলনা করো।

ভেবে দেখো

খুঁজে দেখো

১। নীচের বিবৃতিগুলির সঙ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো :

১.১) বিবৃতি: মৌর্য-পরবর্তীযুগে অনেকগুলি গিল্ড গড়ে উঠেছিল।

ব্যাখ্যা : ১- রাজারা ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ানোর জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ২- কারিগর ও ব্যবসায়ীরা গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

ব্যাখ্যা : ৩- সাধারণ মানুষ টাকা লেনদেন ও গচ্ছিত রাখার জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

১.২) বিবৃতি: দাক্ষিণাত্যে ভালো তুলোর চাষ হতো।

ব্যাখ্যা : ১- দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি তুলো চাষের পক্ষে ভালো ছিল।

ব্যাখ্যা : ২- দাক্ষিণাত্যের সমস্ত কৃষক শুধু তুলোর চাষ করতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- দাক্ষিণাত্যের মাটিতে অন্য কোনো ফসল হতো না।

২। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

২.১) জনপদ হলো ———— (কৃষিভিত্তিক/শিল্পভিত্তিক/শ্রমিকভিত্তিক) গ্রামীণ এলাকা।

২.২) মৌর্য আমলে অর্থনীতি মূলত ———— (শিল্পের/কৃষির/ব্যবসাবাণিজ্যের) উপরে নির্ভর করত।

২.৩) গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিদানকে বলা হয় ———— (সামন্ত/বেগার/অগ্রহার) ব্যবস্থা।

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

৩.১) প্রথম নগরায়ণ (হরপ্পা) এবং দ্বিতীয় নগরায়ণ (মহাজনপদ)- এর মধ্যে কোন ধরনের পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে?

৩.২) প্রাচীন ভারতে জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কেন? সেযুগের জলসেচ ব্যবস্থার সঙ্গে আজকের দিনের জলসেচ ব্যবস্থার কোন পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে কি?

৩.৩) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে কৃষির পদ্ধতি ও উৎপাদিত ফসলের মধ্যে কী কী তফাৎ দেখা যায়?

৪। হাতেকলমে করো :

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে কোন কোন পেশার মানুষদের কথা তুমি জানতে পারলে, তার তালিকা তৈরি করো। তার মধ্যে কোন কোন পেশা আজও দেখা যায়? বৈদিক সমাজে চালু জীবিকাগুলির সঙ্গে এইসময়ের পেশাগুলির কী কী মিল-অমিল দেখা যায়?

৮

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক

শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প

স্যার বললেন, তোমরাতো সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছ । দেখেছো যে, শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকাতেই মানুষ খুশি ছিল না। নানা কিছু তৈরি করে চারপাশকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করল তারা। গুছিয়ে ভালো ভাষায় নিজের ও অন্যের কথা লিখল। এভাবেই শিল্প, সাহিত্যের শুরু হলো। তার পাশাপাশি চারপাশের নানা কিছু নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হলো তাদের মনে । সেইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শুরু হলো বিজ্ঞানচর্চার। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশেও সেভাবেই শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা শুরু হলো। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের চর্চা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

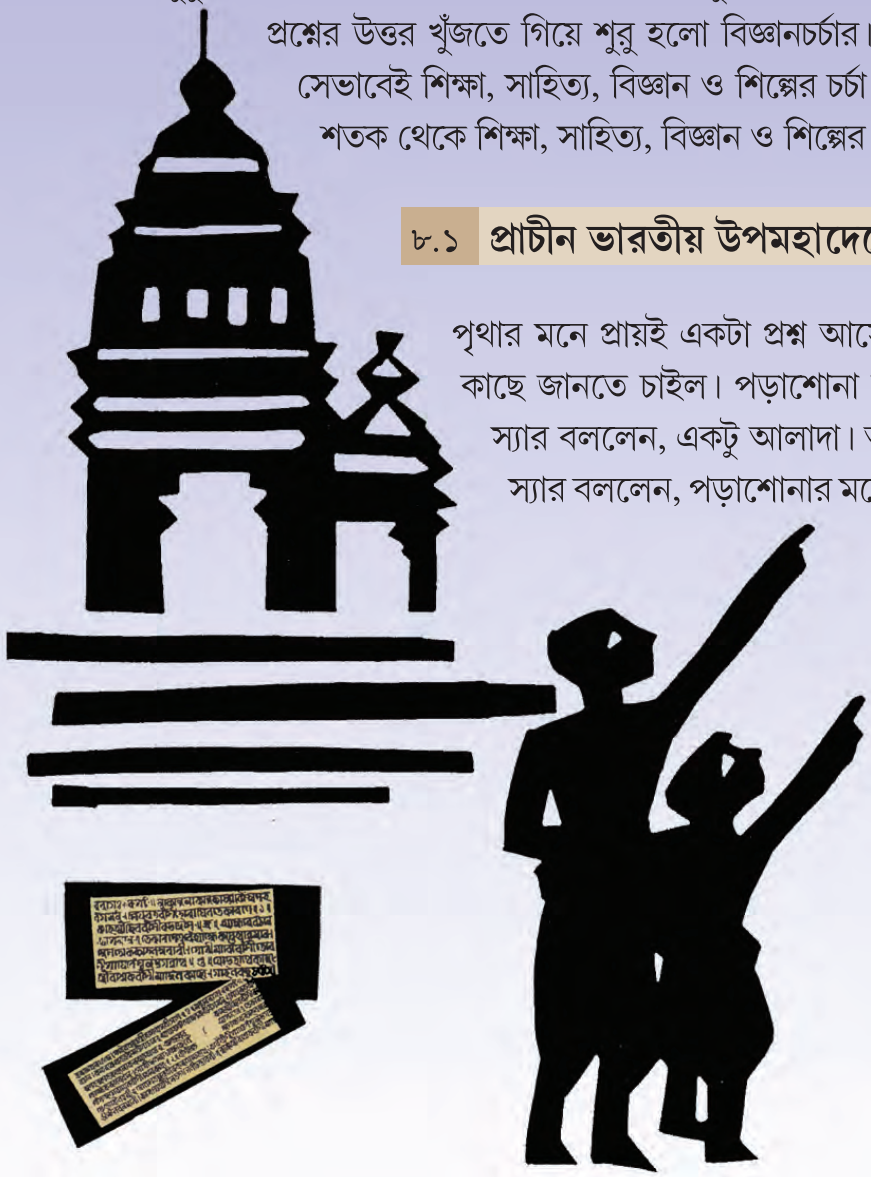

৮.১ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাচর্চা

পৃথার মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন আসে। আজ ক্লাসে ও সেটা স্যারের কাছে জানতে চাইল। পড়াশোনা আর লেখাপড়া কি একই স্যার? স্যার বললেন, একটু আলাদা। আব্বাস বলল, কীরকম আলাদা? স্যার বললেন, পড়াশোনার মধ্যে পড়া আর শোনার কথা আছে।

কিন্তু লেখার কথা নেই। অন্যদিকে লেখাপড়ার মধ্যে লেখা আর পড়ার কথা আছে। আজকাল তোমরা পড়া, শোনা ও লেখা তিনটেই করতে পারো। কিন্তু ধরো, যখন লেখার চল ছিল না, তখনতো শুনে শুনেই মনে রাখতে হতো। হরপ্পায় লিপি ছিল, কিন্তু সাহিত্য ছিল কিনা জানা যায় না। অরুণ বলল, জানি স্যার, হরপ্পার লিপি আমরা এখনো পড়ে উঠতে পারিনি। সেলিম বলল, স্যার অনেকদিন আগে পড়াশোনা ও লেখাপড়া তাহলে কেমনভাবে হতো?

পরবর্তী বৈদিক যুগের পড়াশোনার প্রথা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদও প্রচলিত ছিল। তবে তার পাশাপাশি বৌদ্ধবিহারগুলিতে এক নতুন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন ধরনের লিপির ব্যবহার শুরু হয়। ফলে মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন লিপিগুলিও ছাত্রদের শিখতে হতো। বৈদিক শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ গুরু শিষ্য সম্পর্ক-কেন্দ্রিক। তাকে *গুরুকুল ব্যবস্থা* বলা হতো। অন্যদিকে বৌদ্ধরা লেখাপড়া শিখত *বিহার* বা *সংঘে*। ছাত্রদের সেখানে থেকে পড়তে হতো। নতুন কতগুলি বিষয় এই সময় পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত হয়। কৃষি, চিকিৎসা, রাজ্য শাসন প্রভৃতি বিষয়ও পড়তে হতো। এই সময় *আশ্রম* নামে শিক্ষাকেন্দ্রের বিকাশ ঘটে। সেখানে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো।

বৌদ্ধবিহারগুলিতে ধর্মীয় বিষয়গুলি ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও পড়াশোনা হতো। সেখানে তির ও তরবারি চালানো, কুস্তি ও নানাধরনের খেলাধুলো শেখানো হতো। শ্রমণ ও ভিক্ষুদের সুতোকাটা, কাপড় বোনা শিখতে হতো। বিহারগুলিতে ছাত্রদের থাকার জন্যে আলাদা ঘর থাকত। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা যাচাই করেই নেওয়া হতো। পড়াশোনার জন্য বেতন দিতে হতো। গরিব ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৃত্তি দেওয়া হতো।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ বিভিন্ন বিষয়ের পড়াশোনার কথা জানা যায়। বেদের পাশাপাশি ছন্দ, কাব্য, ব্যাকরণ পড়ানো হতো। তার সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন প্রভৃতিও পড়তে হতো। তবে মূলত ব্রাহ্মণরাই ঐ বিষয়গুলি চর্চা করতেন। ক্ষত্রিয়দের রোজকার শাসন চালানোর জন্য কিছু বিষয় পড়তে হতো। যেমন, যুদ্ধ ও শিকার, মুদ্রা ও নথিপত্র পরীক্ষা। বৈশ্য ও শূদ্রদের ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হতো। এর থেকে বোঝা যায় জীবিকার সঙ্গে পড়াশোনার একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সময় থেকেই কারিগরি বিষয়ে পড়াশোনার কথা বেশি করে জানা যায়। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুর ভূমিকাই ছিল প্রধান। অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ছাত্ররা কোনো দক্ষ কারিগরের কাছে যেতেন। কারিগর-গুরুর বাড়িতেই ছাত্ররা থাকত। তাঁর কর্মশালাতেই কাজ শিখত। কাজ শেখার শেষে অনেকেই গুরুর কর্মশালাতেই কাজ করত। কেউ কেউ গুরুর অনুমতি নিয়ে নিজের আলাদা কর্মশালা তৈরি করত।

গুপ্তযুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। তবে গুরুর বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করার পুরোনো পদ্ধতিরও চল ছিল। এই সময় বিভিন্ন রাজারা বিদ্যালয় তৈরি করেছিলেন। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে লিপি ও ভাষা এবং বৈদিক সাহিত্য ছিল প্রধান। পাশাপাশি কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ,

নাটক, আইন, রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যাও পড়ানো হতো। পেশাভিত্তিক শিক্ষার ওপরেও এ সময়ে জোর দেওয়া হয়।

কিছু কিছু বৌদ্ধবিহারকে মহাবিহার বলা হতো। দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন ছাত্র ঐ মহাবিহারগুলিতে পড়তে আসত। নালন্দা, তক্ষশিলা, বিক্রমশীল ও বলভী মহাবিহারগুলি খুবই বিখ্যাত ছিল। রাজারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জমি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র, কনৌজ, উজ্জয়িনী, মিথিলা, তাঞ্জোর, কল্যাণ প্রভৃতি নগরে।

নালন্দা মহাবিহারে যে-কোনো ধর্ম ও বর্ণের ছাত্ররা পড়তে পারত। তবে তাদের কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে সেখানে ভর্তি হতে হতো। সেখানে থাকা, খাওয়া ও পড়ার জন্য কোনো খরচ লাগত না। লেখাপড়া শেষ হবার পর নালন্দাতে রীতিমতো পরীক্ষা দিতে হতো। চিন, তিব্বত, কোরিয়া, সুমাত্রা, জাভা থেকে ছাত্ররা নালন্দায় পড়তে আসত। নালন্দাতে সেই সময়ের অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত পড়াতেন।

টুকরো কথা
তক্ষশিলা মহাবিহার

গন্ধার মহাজনপদের রাজধানী ছিল তক্ষশিলা। গ্রিক, পারসিক, কুষাণ, শক নানা বিদেশি শক্তি নানা সময়ে তক্ষশিলা দখল করে। ফলে সেখানে নানা দেশের মানুষ ও পণ্ডিত লোকের আনাগোনা ছিল। বৌদ্ধধর্ম তক্ষশিলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা তক্ষশিলায় যেত উচ্চশিক্ষার জন্য। ষোলো থেকে কুড়ি বছর বয়সের ছাত্ররা সেখানে ভর্তি হতে পারত। ধর্ম বা বর্ণ নয় বরং যোগ্যতা যাচাই করেই ছাত্রদের নেওয়া হতো। মোটামুটি আটবছর তারা সেখানে লেখাপড়া করত। রাজা ও ব্যবসায়ীরা এই মহাবিহার চালানোর জন্য টাকাপয়সা বা জমি দান করতেন।

এখানে পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল বেশ সহজ। মনে হয় লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তবে লেখাপড়ার মান ছিল বেশ ভালো। এই মহাবিহারের কয়েকজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন জীবক, পাণিনি এবং চাণক্য।

গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে অনেকটা আজকের দিনের হাতেখড়ির মতো একটি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। তার নাম *বিদ্যারম্ভ* (বিদ্যা + আরম্ভ)। পাঁচ বছর বয়সে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই অক্ষর পরিচয় হতো। এই পর্যায়ে ছাত্রকে একটি পাঠ্য বই ও গণিত পড়ানো হতো।

টুকরো কথা
প্রাচীন ভারতের শিক্ষক

আচার্য ও উপাধ্যায় ছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈদিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত দু-ধরনের শিক্ষক। আচার্যের বাড়িতেই ছাত্ররা থাকত ও খেত। আচার্যরা বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতেন। এর বিনিময়ে ছাত্র আচার্যকে নানা কাজে সহায়তা করত। নারীরাও আচার্য হতে পারতেন। তাঁদের বলা হতো **আচার্যা**।

উপাধ্যায়রা এক একটি নির্দিষ্ট বিষয় পড়াতেন। পড়ানোর বিনিময়ে তাঁরা বেতন নিতেন। নারী উপাধ্যায়কে বলা হতো **উপাধ্যায়া**। বৌদ্ধ শিক্ষায় উপাধ্যায়দের গুরুত্ব ছিল বেশি। তাঁরা বৌদ্ধ বিহারগুলিতে থেকেই পড়াতেন। বৌদ্ধ ছাত্রদের বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘের নিয়ম মেনে চলার শপথ করতে হতো।

৮.২ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য চর্চা

ভাষার ব্যবহার হয় কথা বলতে গিয়ে। আবার লিখতে গিয়েও ভাষা লাগে। তবে মুখের ভাষা আর লেখার ভাষায় অনেক তফাত থাকে। মুখের ভাষায় থাকে আঞ্চলিক টান। কিন্তু লিখতে গিয়ে সেসব ব্যবহার করা হয় না। তখন সবাই যাতে পড়ে বুঝতে পারে তেমন ভাষাতেই লেখা হয়। প্রাচীন ভারতেও মুখের ভাষা ও লেখার ভাষা আলাদা ছিল। ঋকবেদের ভাষা ছন্দস্ বা ছান্দস্ ছিল বলে মনে করা হয়। সেই ভাষাতেই সবাই কথা বলত। কিন্তু ধীরে ধীরে ভাষায় নানা অঞ্চলের টান মিশে যেতে শুরু করে। তাতে নানা অঞ্চলের ভাষা তৈরি হতে থাকে। তাই ভাষা ও তার ব্যবহারকে নিয়মে বাঁধা দরকার। সেই নিয়ম থেকেই তৈরি হয় ব্যাকরণ। পাণিনি নামের এক পণ্ডিত তেমনই একটা ব্যাকরণ লিখলেন। তার নাম *অষ্টাধ্যায়ী*। সেখানে পাণিনি ভাষার নানান নিয়ম তৈরি করলেন। তার ফলে ভাষার সংস্কার হলো। সংস্কার হয়ে যে ভাষাটা তৈরি হলো তারই নাম *সংস্কৃত*।

বিভিন্ন অঞ্চলে একই ভাষা নানাভাবে উচ্চারণ হতে শুরু হয়। সেই ভাষাগুলোকে *প্রাকৃত* বলা হতো। প্রকৃত বা আসল থেকে প্রাকৃত কথাটা এসেছে। ফলে পাণিনির সংস্কার করা ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষা আলাদা। অন্যদিকে ছন্দস্ থেকে ভেঙে ভেঙে তৈরি হলো পালি ভাষা। প্রাকৃত ও পালি ভাষাগুলি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা হলো। তবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লেখালেখি শুরু হয়। জৈন (প্রাকৃত) ও বৌদ্ধ (পালি) ধর্মের সাহিত্য লেখা হলো ঐ ভাষাগুলিতেই।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্যবসাবাণিজ্য বাড়তে থাকে। ফলে সমাজে বৈশ্যদের মর্যাদা বেড়ে যায়। নতুন তৈরি হওয়া নগরগুলোয় জাতি ও বর্ণের কড়াকড়ি কমতে থাকে। তাই পুরোনো জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত ভাষায় *ধর্মশাস্ত্র* লেখার চল শুরু হয়। ব্রাহ্মণরাই যে শ্রেষ্ঠ, সে কথাটাই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নানাভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হতো। এর পাশাপাশি *স্মৃতিশাস্ত্র* বলে এক ধরনের লেখালেখি শুরু হয়। সেগুলিতে সম্পত্তির অধিকার ও রোজকার জীবনের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করা হতো। ধর্মশাস্ত্রগুলিতে রাজনীতি নিয়েও কিছু কথা থাকত। তবে ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি লেখার কাজ পরবর্তী সময়েও চলেছিল। তাছাড়া রাজনীতি বিষয়ে বই লেখার প্রচলন এই সময় হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে বিখ্যাত হলো *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*।

টুকরো কথা

মোগলমারি বৌদ্ধবিহার

ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর লেখা থেকে জানা যায় বাংলায় অনেকগুলো বৌদ্ধ-বিহার ছিল । তার মধ্যে একটি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন শহরের কাছে মোগল-মারিতে। প্রত্নতাত্ত্বিক ড. অশোক দত্ত ঐ বৌদ্ধ-বিহারটি আবিষ্কার করেন। এই বৌদ্ধ-বিহারটি নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সময়েরই। পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ-প্রত্নস্থলের মধ্যে এখনও এটি সবথেকে বড়ো। তবে এই বৌদ্ধবিহারটির নাম কী ছিল তা এখনো জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন, সুবর্ণরেখা নদী এই বিহারটির খুব কাছ দিয়ে বয়ে যেত। মগধ থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর যাওয়ার পথের মধ্যেই বিহারটির অবস্থান। তাই এই বিহারটিতে বণিকদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনে হয়।

ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হচ্ছিল। নদী ও সমুদ্র পারাপারের সময় গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে জানাবোঝার দরকার হতো। ফলে এই সময় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ের লেখালেখি দেখা যায়।

টুকরো কথা
প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের লিপি

ভাষা যখন লিখতে হয় তখন লাগে বর্ণ বা লিপি। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে দু-রকমের লিপির চল ছিল। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে বাঁদিকে লেখা হতো। ব্রাহ্মী লেখা হতো বাঁদিক থেকে ডান দিকে। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মী লিপি থেকেই ধীরে ধীরে দেবনাগরী লিপি তৈরি হয়। ধর্মীয় কাজে বা দেবতার কাজে নগরের ব্রাহ্মণরা ঐ লিপির ব্যবহার করতেন। তাই তার নাম দেবনাগরী। ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার খুব বেশি ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালেখ-গুলিতে বেশিরভাগ ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগেই ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার শুরু হয়। ধীরে ধীরে এই লিপির নানা বদল ঘটেছিল।

টুকরো কথা
রামায়ণ ও মহাভারত

রামকে নিয়ে লেখা হয়েছে যে প্রাচীন মহাকাব্য তাই **রামায়ণ**। রামায়ণের কবি হিসাবে বাল্মীকির নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে মোট চব্বিশ হাজার শ্লোক রয়েছে। পুরো মহাকাব্যটি সাতটি কাণ্ডে (ভাগ) ভাগ করা। এর মধ্যে প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডটি সম্ভবত বাল্মীকির লেখা নয়। সে দুটি পরে রামায়ণে যোগ করা হয়েছিল।

রামায়ণের প্রধান চরিত্র রাম, সীতা ও রাবণ। রাম-রাবণের যুদ্ধকে ঘিরেই রামায়ণের মূল গল্প। অবশ্য পরবর্তী সময়ে রামায়ণের নানারকম অনুবাদ হয়েছিল। সেগুলোতে গল্পের মধ্যে বেশ কিছু বদলও দেখা যায়। ঠিক কবে মূল রামায়ণ রচনা হয় তা বলা মুশকিল। তবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের আগেই রামায়ণ রচনা হয় বলে মনে হয়। কারণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ পালি সাহিত্যে রামায়ণের গল্প দেখা যায়।

মহাভারত মহাকাব্য আসলে ভরত গোষ্ঠীর জীবন ও কাজকর্মের গল্প। মহাভারতে আদিতে আট হাজার আটশো শ্লোক ছিল। বলা হয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের কথা নিয়েই মহাভারত রচনা করেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদের জয় হয়েছিল। মহাভারতের আদিনাম ছিল **জয়কাব্য**। বৈশম্পায়ন তাতে আরো শ্লোক যোগ করে তার নাম দেন **ভারত**। সৌতি পরে আরো শ্লোক জুড়ে **মহাভারত** নাম রাখেন। অর্থাৎ মহাভারত কোনো একজনের রচনা নয়।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে মহাভারতের কথা বিশেষ জানা যায় না। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যে মহাভারত সংকলন হয়েছিল। মহাভারতের চর্চা করলে বেদচর্চার মতোই সুফল হবে বলা হতো। তাই মহাভারতকে **পঞ্চমবেদ** বলা হয়েছে।

মহাভারতের মূল বিষয় কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ। তার পাশাপাশি ভূগোল, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিষয়েও অনেক আলোচনা রয়েছে। পুরো মহাভারত আঠারোটি সর্গ বা ভাগে ভাগ করা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক নাগাদ মহাকাব্য দুটি আজকের চেহারা পায়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন অভিধান লেখার কথা জানা যায়। নাটক ও অভিনয় ছিল উঁচুতলার মানুষের বিনোদনের মাধ্যম। ফলে নাটক ও অভিনয় বিষয়ে বিভিন্ন লেখালেখি শুরু হয়েছিল। যেমন, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-র কথা বলা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় নানা রকমের সাহিত্য লেখা হয়েছিল। তখন আস্তে আস্তে সংস্কৃত ভাষা রাজদরবারে গুরুত্ব পাচ্ছিল। এই সময়ে পতঞ্জলি *মহাভাষ্য* নামে সংস্কৃতে ব্যাকরণ বই লেখেন। এই পর্যায়ের দুজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন অশ্বঘোষ এবং ভাস। পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধের কাহিনি লেখা হয়েছিল।

জৈনরা অর্ধ-মাগধী ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই সাহিত্য লিখত। এই সময়ে বেশির ভাগ লেখমালা প্রাকৃত ভাষায় লেখা। সাধারণত শাসনকাজ চালানো হতো প্রাকৃত ভাষাতেই। সাতবাহন-রাজা হালের লেখা *গাহা-সওসঈ* বা *গাথা সপ্তশতী* প্রাকৃত ভাষার একটি বিখ্যাত কবিতা সংকলন।

দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় সাহিত্য লেখার প্রচলন এই সময়েই শুরু হয়। জানা যায় যে, মাদুরাই নগরীতে তিনটি সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনগুলি *সঙ্গম* নামে পরিচিত। সঙ্গম মানে এক জায়গায় জড়ো হওয়া। তাই তামিল সাহিত্যকে *সঙ্গম সাহিত্য* বলা হয়। প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যের অন্যতম সেরা উদাহরণ একটি কবিতা সংকলন। সেই কবিতাগুলিতে অনেক সাধারণ মানুষের কথা পাওয়া যায়। কৃষকের জীবন, গ্রামের ছবি ও নগরের নানা কথা ঐ কবিতাগুলিতে পাওয়া যায়। তামিল ভাষার ব্যাকরণ চর্চাও এই সময় শুরু হয়েছিল।

চিকিৎসার নানা দিক নিয়েও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের লেখায় নানারকম ওষুধ ও অস্ত্রোপচারের কথা পাওয়া যায়। *চরক-সংহিতা* ও *শুশ্রুত-সংহিতা* চিকিৎসা নিয়ে লেখা দুটি বিখ্যাত বই। সেই সময় সমাজে চিকিৎসার গুরুত্ব এতটাই ছিল যে, চিকিৎসা শাস্ত্রকে *উপবেদ* বলা হতো। তাছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও বই লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬৫০ অব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তবে এই সময়ে সাহিত্য যাঁরা লিখতেন ও যাঁরা পড়তেন তারা সবাই উঁচুতলার মানুষ ছিলেন। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি ঐ লেখাগুলি থেকে বিশেষ পাওয়া যায় না। সম্রাট ও রাজাদের দরবারে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা হতো। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই পুরো সময়কালে মহিলা সাহিত্যিকের কথা জানা যায় না।

টুকরো কথা

পুরাণ

পুরাণ শব্দটির একটি অর্থ পুরোনো। পুরাণে সেই পুরোনো দিনের কথাই থাকে। পুরাণ সংখ্যায় আঠারোটি। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতকের আগেই কয়েকটি পুরাণ রচিত হয়েছিল। বাকি পুরাণগুলি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যে রচনা করা হয়।

রাজবংশগুলির ইতিহাস পুরাণের একটি প্রধান আলোচনার বিষয়। তাছাড়া কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতির কথাও পুরাণে রয়েছে। পুরাণ- গুলির সঙ্গে অনেক সময়েই ইতিহাস শব্দটিও যুক্ত রয়েছে। প্রাচীন ভারতে পুরাণ ও ইতিহাসের তফাত নির্দিষ্ট ছিল না। ফলে পুরাণ হলো এমন গল্পকথা যাতে কিছু কিছু ইতিহাসের উপাদানও মিশে রয়েছে।

মূর্তি, চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের বিষয়েও সংস্কৃতে বই লেখা হয়েছিল। কিন্তু কারিগরি শিল্পের উপরে আলোচনা কোনো বইতে দেখা যায় না। গুপ্তযুগেও নাটক, অভিধান ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানান লেখাপত্রের কথা জানা যায়। কবি এবং নাট্যকার কালিদাস ছিলেন এই সময়ের সবথেকে বিখ্যাত সাহিত্যিক। শূদ্রক, বিশাখদত্ত এবং ভারবি প্রমুখও ছিলেন এই পর্যায়ের বিখ্যাত লেখক।

টুকরো কথা
শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম

শূদ্রকের **মৃচ্ছকটিকম** প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাটক। মৃচ্ছকটিকম কথাটির মানে হলো **মাটির তৈরি ছোটো গাড়ি**। **মৃৎ** মানে মাটি আর **শকটিকা** মানে ছোটো শকট বা গাড়ি। এই দুয়ে মিলে মৃচ্ছকটিকম। এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র চারুদত্ত। তার ছেলে ছোট্ট রোহসেন প্রতিবেশী বণিকের ছেলের সোনার তৈরি খেলনাগাড়ি দেখে। ঐ রকম একটি খেলনাগাড়ির জন্য বায়না ধরে রোহসেন। তখন তাকে ভোলানোর জন্য একটা মাটির খেলনাগাড়ি দেওয়া হয়। কিন্তু রোহসেনের বায়না ও কান্না তাতে থামে না। এই নাটকের আরেক প্রধান চরিত্র বসন্তসেনা। রোহসেনের কান্না দেখে সে কষ্ট পায়। রোহসেনের খেলনাগাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য বসন্তসেনা নিজের সোনার গয়না দিয়ে দেয়। এই নাটকের চরিত্রগুলি সব সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনের সুখ-দুঃখই নাটকটিতে ফুটে উঠেছে।

বিশাখদত্তের লেখা দুটি নাটক খুব বিখ্যাত। *মুদ্রারাক্ষস* ও *দেবীচন্দ্রগুপ্তম*। নন্দরাজা ধননন্দকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন দখলই মুদ্রারাক্ষসের বিষয়বস্তু। গুপ্তবংশের রাজা রামগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে শকরাজার যুদ্ধকে নিয়ে লেখা হয়েছিল *দেবীচন্দ্রগুপ্তম* নাটক। এর থেকে বোঝা যায় সেকালে ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও সাহিত্য লেখা হতো।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য লেখার প্রচলন দেখা যায়। তবে সেই গদ্যগুলি পালি ভাষায় লেখা গদ্যের মতো সরল ছিল না। দণ্ডীর লেখা *দশকুমার চরিত* সংস্কৃত গদ্যে লেখা একটি বিখ্যাত বই। ভর্তৃহরি ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত ব্যাকরণবিদ ও সাহিত্যিক। অমরসিংহের সংকলন করা *অমরকোষ* এই সময়ের একটি বিখ্যাত অভিধান। সম্রাট ও রাজারাও লেখালেখির চর্চা করতেন। জানা যায় যে, রাজা হর্ষবর্ধন নিজেও তিনটি নাটক লিখেছিলেন। সেগুলি হলো *নাগানন্দ*, *রত্নাবলী* ও *প্রিয়দর্শিকা*।

টুকরো কথা
অশ্বঘোষ ও ভাস

সাধারণভাবে মনে করা হয় অশ্বঘোষ কনিষ্কের সময়ের সাহিত্যিক ছিলেন। নিজের রচনায় নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি অশ্বঘোষ। কেবল এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর বিখ্যাত রচনা হলো **বুদ্ধচরিত কাব্য।** গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বক্তব্যই বুদ্ধচরিত কাব্যের মধ্যে ধরা আছে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের নাট্যকার ছিলেন ভাস। তাঁর কয়েকটি নাটক মহাভারত ও রামায়ণের বিষয় নিয়ে লেখা।

চিকিৎসা বিষয়েও বই লেখা গুপ্তযুগে চালু ছিল। বাগভট্ ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। পশু চিকিৎসা নিয়েও কয়েকটি বই লেখা হয়েছিল। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই গুপ্তযুগে লেখা হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ তামিল অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিশেষভাবে খেয়াল করা যায়। এর ফলে তামিল ভাষাতেও সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ কবিতা লেখার চল শুরু হয়। ঐ দীর্ঘ কবিতাগুলিকে তামিল সাহিত্যে মহাকাব্য বলা হতো। এমনি দুটি মহাকাব্য ছিল *শিলপ্পাদিকারম* ও *মণিমেখলাই*। তামিল কবিরা রামায়ণেরও নানান অনুবাদ করেছিলেন। কম্বনের রামায়ণের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। তবে কম্বন তাঁর রামায়ণে অনেক নতুন গল্প যোগ করেছিলেন। সেখানে রামের থেকে রাবণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

টুকরো কথা
সাহিত্যে নীতিশিক্ষা

ঠিক-ভুল বিচার শেখানোর জন্য পুরোনো আমলে একধরনের বই লেখা হতো। সেই বইগুলিতে মানুষ ও বিভিন্ন পশুপাখির চরিত্র থাকত। তাদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই গল্পগুলো তৈরি হতো। বিভিন্ন ঘটনায় কেমন আচরণ করা উচিত, সেটাই গল্পগুলোর মূল কথা হতো। তাই এইধরনের গল্পের বইগুলিকে নীতিশিক্ষার সংকলন বলা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা **পঞ্চতন্ত্র** তেমনই একটি নীতিগল্পের সংকলন। সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ এর গল্পগুলি সংকলন করা হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের মূল রচনাটি পাওয়া যায়নি। জানা যায় যে, একজন রাজা তাঁর ছেলেদের বোকামিতে দুঃখ পেয়েছিলেন। তখন পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার কাছে ছেলেদেরকে পাঠান পড়াশোনার জন্য। বিষ্ণুশর্মা বিভিন্ন নীতিগল্পের মধ্যে দিয়ে ছয়মাসেই রাজার ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আদতে গল্পগুলো ছোটোদের জন্য লেখা হয়েছিল। তবে সেগুলির ভেতরে সবার জন্যই নানান বক্তব্য রয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের মতোই বিভিন্ন গল্পসংকলনে নীতিশিক্ষা দেওয়া হতো। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও এধরনের নীতিশিক্ষামূলক রচনার চল ছিল। বৌদ্ধজাতকগুলি এর বড়ো উদাহরণ। তামিল সাহিত্যেও নীতিশিক্ষার কথা পাওয়া যায়।

টুকরো কথা
কালিদাস

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন কালিদাস। তবে তিনি কোন সময়ের মানুষ ছিলেন, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মোটামুটিভাবে মনে করা হয় তিনি গুপ্তযুগের সাহিত্যিক ছিলেন। কালিদাসের জীবন নিয়ে অনেক গল্পকথাও প্রচলিত রয়েছে। কাব্য ও নাটক — দুই-ই লিখেছেন কালিদাস। **মেঘদূতম, কুমারসম্ভবম** তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত কাব্য। **অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মালবিকাগ্নিমিত্রম** প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত নাটক। তাঁর রচনায় সেই সময়ের সমাজ ও প্রকৃতির নানাদিক ফুটে উঠেছে।

৮.৩ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চা

বিজ্ঞান কথার মানে কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন করা। *প্রযুক্তি* কথার মানে প্রয়োগ করা। বিজ্ঞানের নানা কিছু জ্ঞান রোজকার জীবনে প্রয়োগ করা দরকার হয়। যেমন, বাড়ি বানাতে জ্যামিতির ধারণা প্রয়োগ করতে হয়। তাই বাড়ি বানাবার কাজটা প্রযুক্তির অংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সমাজের যোগ আছে। এক এক সমাজে এক এক রকম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দরকার হয়। ধরা যাক, একটা সমাজের মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানে না। ঐ সমাজে ধাতু বিজ্ঞান ও ধাতু প্রযুক্তির দরকার হবে না। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা ও বৈদিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ছিল। সেসব আলোচনা আগেই হয়েছে। এবারে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ থেকে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

টুকরো কথা
লক্ষ্মণের শক্তিশেল

রামায়ণে একটা গল্প রয়েছে। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তিশেল অস্ত্রের আঘাতে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বৈদ্য সুষেণ বলেছিলেন ক্ষতস্থানে **বিশল্যকরণী** লাগিয়ে দিলেই লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। বিশল্যকরণী একটি ঔষধি গাছ। ঔষধি খুঁজতে হনুমান গেলেন গন্ধমাদন পর্বতে। কিন্তু বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরো পর্বতটাই তুলে নিয়ে এলেন হনুমান। বিশল্যকরণী লাগানোর ফলে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠেলেন। বিশল্যকরণী কথার মানে বিশেষ রূপে শল্যকরণের পর (অস্ত্রোপচারের পর) যে ওষুধ লাগানো হয়। আদতে এটা গল্প হলেও, চিকিৎসার প্রসঙ্গটা জরুরি।

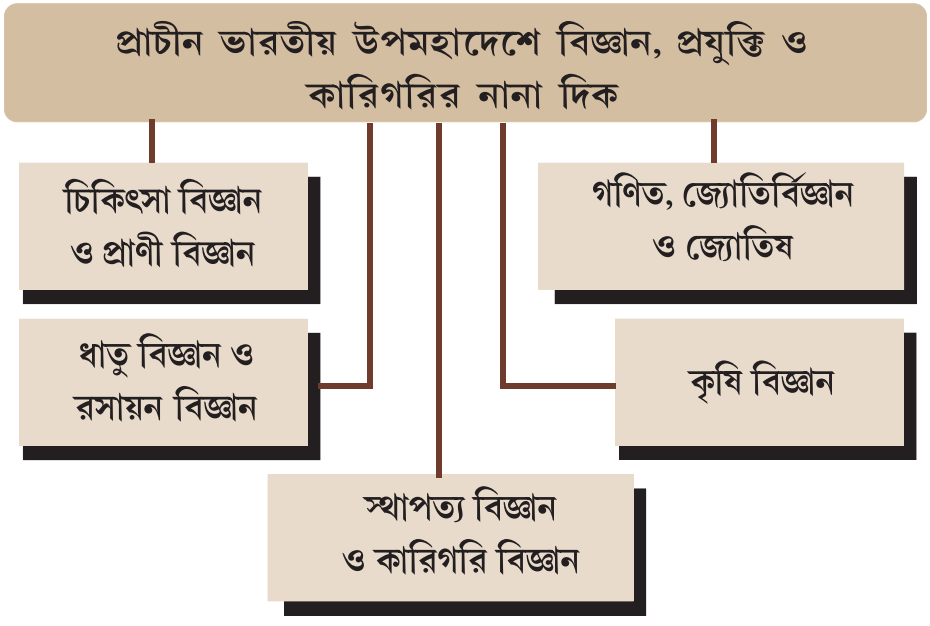

পরবর্তী বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের কথা রয়েছে। *চরক সংহিতায়* প্রায় সাতশো ঔষধি গাছপালার কথা পাওয়া যায়। এই বইতে রোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আছে। একটি আদর্শ হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত তার বিবরণ চরক সংহিতায় পাওয়া যায়। হাড় ভেঙে গেলে, বা নাক, কান ইত্যাদি কেটে গেলে তা জোড়ার কাজে শল্য চিকিৎসকরা ছিলেন অত্যন্ত পটু। এই বিদ্যায় বিখ্যাত ছিলেন শুশ্রুত।

টুকরো কথা
জীবক

জীবক ছিলেন বুদ্ধের সময়কালের বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি ছিলেন বিম্বিসারের রাজবৈদ্য। তাঁর জন্ম রাজগৃহে হলেও, তিনি তক্ষশিলায় গিয়ে গুরু আত্রেয়র কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

শিক্ষা শেষ হবার পর গুরু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দেন আশেপাশের এলাকা থেকে ভেষজগুণহীন গাছপালা জোগাড় করে আনতে। নির্দিষ্ট সময়ের পর জীবক বাদে অন্য সবাই নমুনা জোগাড় করে ফিরে আসে। অনেক পরে জীবক খালি হাতে ফিরে এলে গুরু অবাক হন। এর কারণ জানতে চাইলে জীবক বলেন, ভেষজগুণহীন কোনো গাছ তার নজরে পড়েনি। এই উত্তরে গুরু খুশি হন। তিনি বুঝতে পারেন ভেষজ উদ্ভিদ বা ঔষধি সম্বন্ধে জীবকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। জীবক রাজা বিম্বিসার ও গৌতম বুদ্ধকে বেশ কয়েকবার কঠিন রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছিলেন।

জাতিভেদ প্রথা কঠোর হবার ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। বলা হতো আগের জন্মে পুণ্য করলে পরের জন্মে রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এধরনের কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিরোধী ছিল। রোগ সারাতে গেলে নানান রকম খাদ্যের কথা বলা ছিল। অথচ সেই খাদ্যের অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্রের মতে খাওয়া বারণ ছিল। ফলে ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন সময় বিরোধ তৈরি হয়েছিল। *শুশ্রুত সংহিতায়* চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শবব্যবচ্ছেদ বা মড়াকাটা। অথচ ধর্মশাস্ত্রের মতে শব বা মৃতদেহ ছোঁয়া নিষেধ ছিল। ফলে মড়াকাটা নিষিদ্ধ হওয়ার জন্য শারীরবিদ্যা ও শল্যচিকিৎসার চর্চা ধীরে ধীরে কমে গেল। বাগভট্-এর পর থেকে শল্যচিকিৎসার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ ছিল না। তাছাড়া চিকিৎসকরা রোগী ব্রাহ্মণ না শূদ্র তার বিচার করতেন না। ফলে প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথার সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার বিরোধিতা তৈরি হয়।

ভেবে দেখো

বৌদ্ধ মতে চরক প্রথম কনিষ্কের আমলের লোক ছিলেন। তাহলে চরক সংহিতা কি চরক নামে কোনো ব্যক্তির লেখা? চরক কথাটির মানে যারা ঘুরে বেড়ায়। বেদের একটি শাখায় চারণ-বৈদ্য বা ঘুরে বেড়ানো চিকিৎসকদের কথা পাওয়া যায়। তাহলে কী চরক সংহিতা ঐ রকম ঘুরে বেড়ানো চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার সংকলন?

শুশ্রুত কোন সময়ের লোক ছিলেন তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। শুশ্রুত কথাটির মানে যিনি বা যাঁরা ভালো করে শুনেছিলেন। তাহলে শুশ্রুত সংহিতাও কি ঐরকম চারণ-বৈদ্যদের অভিজ্ঞতার সংকলন?

প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষচর্চা দীর্ঘদিন একসঙ্গে চলেছিল। জৈন ও বৌদ্ধরাও গণিতের চর্চা করতেন। তাঁদের ধর্মগ্রন্থ থেকে সে বিষয়ে অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি মিলিয়ে বৌদ্ধদের গণিতবিজ্ঞান তৈরি হয়েছিল। জৈনরা তাকেই বলতেন *সংখ্যায়ন*। সেই সময়ে পড়াশোনায় গণিতের স্থান ছিল সামনের সারিতে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ দুজনেই গণিতের চর্চা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন ছিলেন একজন গণিতবিদ ।

গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের অনেক উন্নতি হয়েছিল। যদিও গুপ্ত যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেকটাই জ্যোতিষচর্চার কাজে ব্যবহার হতো। আর্যভট্ট গণিতকে একটি আলাদা চর্চার বিষয় করে তুলেছিলেন। *আর্যভটীয়* বইতে গণিত, সময় ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর্যভট্ট। সেই বইতে সংখ্যা হিসাবে শূন্যের ব্যবহার করেন তিনি। সেই চর্চা থেকেই দশমিকের ধারণাও শুরু হয়েছিল। আর্যভট্ট বলেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার ও নিজের অক্ষের উপর পৃথিবী ঘুরছে। তাঁর মতে, পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ার ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

আর্যভট্টের পরবর্তীকালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন বরাহমিহির। *সূর্যসিদ্ধান্ত* ও *পঞ্চসিদ্ধান্তিকা* বইতে বরাহমিহির পুরোনো ধারণার অনেক বদল করেছিলেন। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও তার আগাম লক্ষণ কী কী, তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আবার ভূমিকম্পের আগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক লক্ষণ বিষয়ক আলোচনাও বরাহমিহিরের লেখায় পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর হাতেই প্রাচীন ভারতের গণিত সবথেকে বেশি বিকশিত হয়েছিল। *ব্রহ্মসিদ্ধান্ত* তাঁর একটি বিখ্যাত বই।

ছবি. ৮.১ :
মেহরৌলির লোহার স্তম্ভ

প্রাচীন ভারতে খনি ও ধাতু বিজ্ঞানও ছিল যথেষ্ট উন্নত। বিভিন্ন ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, গয়না ও মূর্তি এর প্রমাণ। ধাতু বিজ্ঞানের উন্নতির উদারহণ মেহরৌলির লোহার স্তম্ভটি। স্তম্ভটিতে আজও মরচে পড়েনি। তবে ধাতু

বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন লেখাপত্র বিশেষ পাওয়া যায়নি। ধাতু গলানোর কাজ রসায়নের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতেও রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার হতো। পাশাপাশি সুগন্ধি দ্রব্য ও খাদ্য তৈরিতেও রসায়ন বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কৃষিই ছিল বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা। তাই কৃষিকাজ ও গাছপালা নিয়ে আলোচনাও বিজ্ঞানচর্চার আওতায় পড়েছিল। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল *কৃষিপরাশর* গ্রন্থে। কৃষির পাশাপাশি পশুপাখি নিয়েও বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রাচীন ভারতে হতো বলে জানা যায়।

ইট, পাথর ও ধাতুর ব্যবহার প্রাচীন ভারতের প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চার নানা ক্ষেত্রে দেখা যায়। তার সঙ্গে ছিল নানা রকম যন্ত্র তৈরির কৌশল। তার থেকেই কারিগরি বিজ্ঞানের উন্নতির দিকটাও স্পষ্ট হয়। অস্ত্রোপচারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চিকিৎসকরা নিজেরা তৈরি করতেন না। দক্ষ কারিগরদের বিশেষ করে কামারের উপর তাদের নির্ভর করতে হতো। *শুশ্রুত সংহিতায়* বলা হয়েছে দক্ষ কামারের সঙ্গে চিকিৎসককে আলোচনা করতে হবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেমন হবে তা কারিগরকে বুঝিয়ে দিতে হবে। সেই মতো কারিগর যন্ত্র তৈরি করে দেবেন। ধাতু ও দামি পাথরের বিচার ও পরখ করাও বিজ্ঞানের অংশ বলে ধরা হতো। খনি ও পাথরের বিষয়ে চর্চা ছিল বিজ্ঞানের আওতায়। বিভিন্ন ধাতু মেশানো এবং আলাদা করার চর্চাও হতো।

শুশ্রুত সংহিতায় কারিগরদের ও হাতের কাজকে প্রশংসা করা হয়েছে। বলা হয়েছে হাতই প্রধানতম যন্ত্র। অথচ ধর্মশাস্ত্রে কারিগরদের কাজকে নেহাতই হেয় করা হয়েছে। তার ফলে ধীরে ধীরে কারিগরি শিল্পচর্চা বিজ্ঞানচর্চা থেকে আলাদা হয়ে গেল। যদিও স্থাপত্য বানানোর কারিগরি শিল্প নষ্ট হয়ে যায়নি। ধর্মীয় প্রয়োজনেই বেশির ভাগ স্থাপত্য বানানো হতো। ফলে সেগুলি ছিল মন্দির ও মঠ। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সে ধরনের স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল।

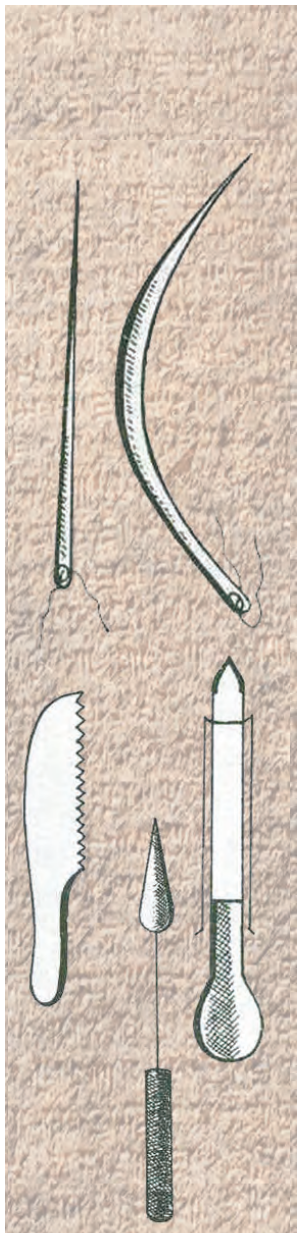

ছবি. ৮.২:
শুশ্রুত সংহিতা অনুযায়ী শল্যচিকিৎসার কয়েকটি যন্ত্রপাতি

টুকরো কথা
প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবেশ চিন্তার প্রধান বিষয় ছিল বন, গাছপালা ও পশুপাখি। বন থেকে নানারকম সম্পদ পাওয়া যেত। ফলে বনের প্রতি শাসকদের বিশেষ নজর দিতে হতো। *অর্থশাস্ত্রে* বিভিন্নরকম বন বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বনের ক্ষতি করলে কড়া শাস্তির কথাও বলা আছে। সম্রাট অশোক বেশ কিছু পশুপাখি মারতে নিষেধ করেছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ কৃষিকাজ ও নগর বসতি বাড়তে থাকে। ফলে জঙ্গল (অরণ্য) কাটা শুরু হয়। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় গ্রাম হলো চেনাজানা অঞ্চল। অন্যদিকে জঙ্গল হল অচেনা। জঙ্গলে থাকা মানুষজনও অদ্ভুত। জঙ্গলবাসীদের প্রায় সবসময়ই নীচু করে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যে দেখানো হয়েছে রাজপরিবারের কাউকে বিপদে ফেলার জন্য জঙ্গলে পাঠানো হতো। বনের পশুপাখি শিকারের অনেক উদাহরণ লেখাগুলিতে আছে। জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাও সেখানে পাওয়া যায়। *রাক্ষস*রা অনেকে বনেই থাকতেন। তারা ঋষিদের উৎপাত করতেন। রাজারা রাক্ষসদের হাত থেকে ঋষিদের রক্ষা করতেন। নগর যত বাড়তে থাকে, জঙ্গল ততই কমতে থাকে। তাই বিভিন্ন সময় গাছ বাঁচানোর নানান উপায় তৈরি করা হতো। যেমন, বট-অশ্বত্থ গাছকে পুজো করার চল শুরু হয়। তাই ঐসব গাছ তখন আর কাটা যেত না।

রোজকার জীবনে, কৃষিকাজে ও নানা ধর্মীয় কাজে জল ছিল খুব জরুরি। তাই জল ধরে রাখা, জলসেচ ও জলাশয় তৈরির নানান উদ্যোগ নেওয়া হতো। ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন জলাশয় তৈরি করিয়ে দিতেন। তবে আজকের তুলনায় সেযুগে জনসংখ্যা অনেক কম ছিল। ফলে পরিবেশের ওপর চাপও কম পড়ত।

ভেবে দেখো

প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার জন্য কী কী বিষয় দায়ী বলে তোমার মনে হয়? আজকের পরিবেশ বাঁচাতে তোমরা দল বেঁধে কী কী কাজ করতে পারো, তার তালিকা বানাও।

৮.৪ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চা

আদিম মানুষ একসময় গুহায় থাকতো। পরে এক সময়ে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকত তারা। তাতে দেয়ালগুলো দেখতেও সুন্দর হতো। অনেক পরে মানুষ বাড়ি বানাতে শুরু করেছিল। প্রয়োজন মতো কাঠ, পাথর, মাটি, ইট দিয়ে নানারকম স্থাপত্য বানিয়েছে মানুষ। তার পাশাপাশি বানিয়েছে নানারকম ভাস্কর্য। আর এঁকেছে ছবি। এইসব মিলিয়েই প্রাচীন আমলে শিল্পচর্চা চলতো। তার সঙ্গে হরেকরকম কারিগরি শিল্পের প্রচলনও ছিল।

প্রাচীন সমাজে স্থাপত্যগুলো মূলত দু-রকম কাজের জন্য বানানো হতো। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য স্থাপত্য বানানোর চল ছিল। ভাস্কর্য ও দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতেও ধর্মীয় নানা বিষয় ফুটে উঠতো। তাছাড়া ছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনে বানানো স্থাপত্য। বিরাট ইমারত বানানো হতো শাসকের ক্ষমতা বোঝানোর জন্য। বাড়ি, প্রাসাদ প্রভৃতি স্থাপত্য ছিল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য। ধর্মীয় কারণে বানানো স্থাপত্যগুলি সব মানুষ ব্যবহার করতে পারতেন। বণিক, ব্যবসায়ীরাও স্থাপত্যের জন্য অর্থদান করতেন। কখনো আবার সাধারণ মানুষ স্তূপ বা মন্দির বানানোয় সাহায্য করতেন।